শ্রীমদ্‌ব্রহ্মানন্দ ভারতী-কৃত

সরল সাংখ্য।

দ্বিতীয় ভাগ।

নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলম্‌।

মহাভারতম্‌।

বালী-বারিকপুরনিবাসী

শ্রীশম্ভুচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,

কালিকা-যন্ত্রে
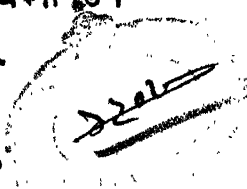
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৭।

মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র।
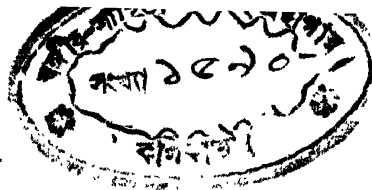
সরল সাংখ্য।

দ্বিতীয় ভাগ।

তৃতীয় অধ্যায়।

কর্ম্মফল।

নব্যগণ কর্ম্মাকর্ম্ম বুঝেন না। তাঁহারা মনে করেন ঈশ্বরনামধারী কোন ব্যক্তির অধীনে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে আমাদের সুখ দুঃখ বা ভাল মন্দ ভোগ করিতে হয়। অতএব জীবমানে ঈশ্বরের উপাসনা অর্থাৎ খোসামোদ করিয়া রাখিলে সম্ভবতঃ ঈশ্বর সদয় হইয়া আমাদের জন্য সুখের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

হিন্দুরা এতাদৃশ মনঃকল্পিত ঈশ্বর মান্য করেন না। হিন্দু দার্শনিকগণ আপন আপন কৃতকর্ম্মকেই সুখ দুঃখ ভোগের হেতু বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁহারা ঈশ্বরকে সুখ দুঃখের নিয়ন্তা বলেন তাঁহাদের ঈশ্বরও এক্ষণকার ন্যায় কল্পিত নহে। সর্ব্বসমষ্টিরূপ এই জগৎপ্রপঞ্চই ঈশ্বরের মূর্ত্তি। অতএব তাঁহাকে কর্ম্মফলদাতার স্বরূপ ধরা যায়। এখানে কর্ম্ম ও ঈশ্বর এই উভয়ই চরমে এক হইয়া যাইতেছে। এই কথাটী উদাহরণ দ্বারা প্রতিপন্ন করার যত্ন করা যাই-

তেছে। যথা পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ বা অনুত্তীর্ণ করা পরীক্ষকের হস্তগত বটে কিন্তু তাঁহার স্বেচ্ছাধীন নহে—বরং পরীক্ষার্থীর প্রদত্ত উত্তরের সাপেক্ষ। সংক্ষেপে বলিলে পরীক্ষার্থীর প্রদত্ত প্রশ্নোত্তর গুলিকেই যেমন পাস ও ফেল হওয়ার হেতু বলা যাইতে পারে, তেমন আমাদের কৃত সদসৎ কর্ম্ম সমূহকে সুখদুঃখের নিদান বলা যায়। যদি বল ভাল মন্দ কর্ম্ম করি কেন? উত্তর—পূর্ব্বকৃত সদসৎ কর্ম্মজনিত সংস্কার দ্বারা বীজ ও বৃক্ষের ন্যায়, কর্ম্ম ও সংস্কার অনাদি প্রচলিত আছে। যেমন বীজ হইতে বৃক্ষ, আবার বৃক্ষ হইতে বীজ জন্মে তেমন কৃতকর্ম্ম হইতে সংস্কার এবং সেই সংস্কার দ্বারা পুনরায় কর্ম্ম করিতে হয়; এইভাবে সংসারচক্র রচিত হইয়াছে এখানে কর্ম্ম ও সংস্কার দ্বারা যে ভাবে সংসারচক্র গঠিত হয় তাহার ক্রম বলা যাইতেছে।

জীবের অনাদিকালের কৃতকর্ম্মসমূহজনিত সংস্কার হইতে বর্ত্তমান জন্মের জন্য একক্ষেপ সংস্কার আরব্ধ হয়। সেই আরব্ধ সংস্কারগুলি জন্ম আয়ুঃ ও ভোগ এই তিনটীকে প্রসব করে।

"সতিমূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ।" ১৩ সূত্র, ২য় পাদ

পাতঞ্জলদর্শন।

মূল অবিদ্যা বিদ্যমান থাকিলে সে কর্ম্মরূপে অভিব্যক্ত হইয়া জীবের জন্ম, আয়ু ও ভোগরূপে পরিণত হয়। জন্ম হইলেই আয়ুঃ—একপলই হউক বা একশত বৎসরই হউক। আবার আয়ুষ্কাল মধ্যে ভাল মন্দ বা মিশ্র ইহার এক বা অপরটী ভুগিতেই হইবে। এই জীবনে সুখ, দুঃখ বা মধ্যমাবস্থা যাহাই ভোগ হইতে থাকে তাহা স্মরণ রূপে অন্তরে দাগ লাগিয়া যায়। সেই স্মৃতিস্বরূপ দাগগুলির গাঢ় (জমাট) ভাবকে সংস্কার বলে। সংস্কার অনুসারে বাসনা জন্মে। মনে কর সমানাবস্থাপন্ন তিনটী বন্ধু একত্রে কলিকাতা নগরে ভ্রমণ করিয়া

নানাভাব অবলোকন করিলে তাহাদের তিনজনের একবিষয়ে সখ্ (বাসনা) উদ্দীপ্ত হইবে না, প্রত্যুত যাহার যেমন সংস্কার উদয়োন্মুখ আছে, সেই সংস্কারের অনুকুল দ্রব্য বা ভাব দেখিয়া, সংস্কারটী বাসনা-রূপে স্ফূর্ত্তি পাইয়া, তাহাকে তদ্বিষয়ে ভাবান্বিত করিবে। সুতরাং কলিকাতা হইতে তিন বন্ধুকে তিনরূপ সখ্ অর্জ্জন করিয়া আসিতে হইবে। এই ভাবে বুঝিতে হইবে যে ভবের হাটে আসিয়া, জীবগণ আপনার অন্তর্নিহিত সংস্কারকে প্রস্ফূটিত করিয়া, বাসনাতে পরিণত করে। সেই বাসনা অনুসারে কর্ম্ম করিতে হয়। এই কর্ম্ম দ্বারা সংস্কার জন্মে। সংস্কারের ঐহিকভাবের উদাহরণ এই যে "গাইতে গাইতে গায়েন, বাজাইতে বাজাইতে বায়েন।" জড়পদার্থ চালাইয়া দিয়া পুনরায় বেগ না দিলেও যে চলিতে থাকে, ইহাকে সংস্কারের বলে চলিতেছে এরূপ বলা যায়। বাদকেরা আহারার্থ উপবিষ্ট হইয়া অনেক সময়ে অন্যমনস্ক ভাবে সংস্কার বশতঃ তাল বাজাইয়া থাকে। এইরূপে মনুষ্যগণ ইহ-লোকে পাপ, পুণ্য বা মিশ্র কর্ম্ম করিয়া আগামী জন্মের জন্য সংস্কার অর্জ্জন করিতেছে। সেই সংস্কারের বলানুসারে মরণান্তে কেহ দেবতা, কেহ মনুষ্য, কেহ বা নরকের দেহ ধারণ করিতে বাধ্য হয়। এইভাবে বলা হয় কর্ম্ম হইতে জন্ম ঘটে। যে দেহ ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করা যায় সেই দেহ যতদিন জীবিত থাকে তাহাকে আয়ুঃ বলে; আয়ুষ্কাল মধ্যে সুখদুঃখের ভোগ হয়। অতএব কর্ম্ম হইতে জন্ম, আয়ুঃ ও ভোগের সমাবেশ ধরা গেল। ভোগ হইয়া গেলে সময়ে সময়ে স্মৃতিরূপে ভুক্ত বিষয়টী জাগ্রত হইয়া থাকে।

ভোগটী যদি চিত্তের অনুকূল হয়, তবে তাহা স্মরণ করিয়া তাদৃশ প্রিয় ভোগের শাখাপ্রশাখা বিস্তার করার বাসনা জন্মে। আর ভোগটী প্রতিকূল হইলে তৎপ্রতি দ্বেষভাব আগত হয় ও তখন সেই অপ্রিয়

ভোগ স্মরণ করিয়া, তাহার বিপক্ষে নানারূপ বাসনা উদিত হইতে থাকে। এজন্য ভোগের স্মরণ হইতে বাসনার উন্মেষ বলা যায়, কিন্তু মূলে পূর্ব্বসংস্কারকেই মুখ্য কারণ বুঝিতে হইবে। আবার বাসনাবশতঃ জীবের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়। এইরূপে জীবগণ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুযায়ী সংস্কার দ্বারা চালিত হইয়া ইহজীবনে নূতন কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। তাহা আবার সংস্কারে পরিণত হইয়া থাকে। এখানে যে সকল কথা বলা হইল তাহা হৃদয়ঙ্গম রাখার জন্য নিম্নে চিত্র দেওয়া যাইতেছে।
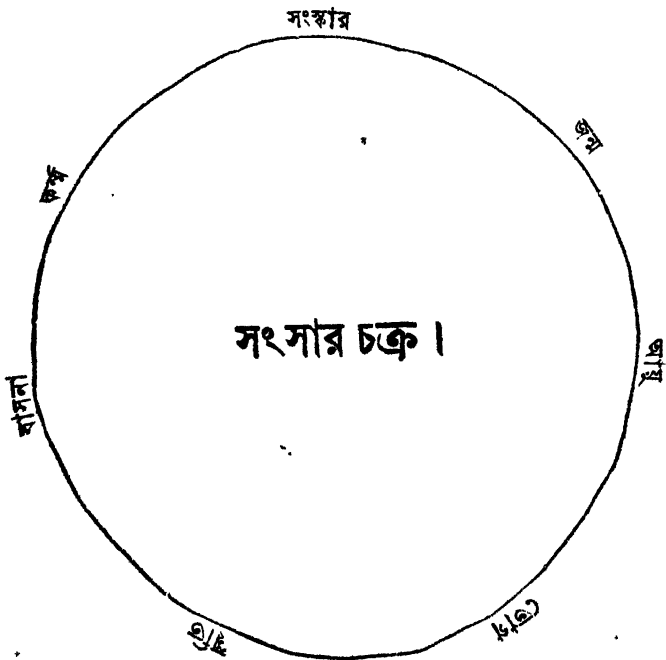
শাস্ত্রে ও প্রাচীন লোকের মুখে শুনা যায়,—ভালকর্ম্ম করিলে মরণান্তে স্বর্গ, মন্দ কর্ম্মের ফলে নরক হয়; মিশ্র কর্ম্ম দ্বারা মর্ত্ত্যলোকে জন্ম হইয়া থাকে।

ভাল ও মন্দের লক্ষণ কি?—বেদে যাহা পুণ্য কর্ম্ম বলে তাহাই ভাল, যাহা পাপ বলিয়া ঘৃণিত তাহার নাম—মন্দকর্ম্ম।

নব্য মনুষ্যেরা বেদকে, রাখালের গান মনে নাই করুক—কতক-গুলি মনুষ্যের মত প্রকাশক গ্রন্থ বিশেষ বলিয়া ধরিয়া লয়। পুনর্জ্জন্মই মানেনা স্বর্গ নরক আর কোথায় লাগে?

যাহারা ম্লেচ্ছ পথে এতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন, তাহাদের প্রতি আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই।

এই দলের লোক ভিন্ন, এমন অনেক নব্য মনুষ্য আছেন, যে তাঁহারা ম্লেচ্ছ শিক্ষার বাহিরেও অন্তঃকরণ ধাবিত করিতে সমর্থ।

সেই সকল স্বাধীন-চেতা মনুষ্যগণ বিচার করিয়া দেখিবেন, এইবারেই যদি আমরা সর্ব্ব প্রথমে জন্মগ্রহণ করিলাম, তবে এক গৃহে জাত এক-রূপে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের প্রকৃতিগত এত বৈষম্য দৃষ্ট হয় কেন? এক জন যে কার্য্য ভালবাসে অন্যে তাহার বিপরীত আচরণের পক্ষপাতী।

সাংখ্যবিদ্‌গণ বলেন—অন্তঃকরণের বিভিন্ন বাসনানুসারে লোকে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে রত হইয়া থাকে। সৎপ্রকৃতি মনুষ্যের মধ্যে সাধুবাসনা ও দুষ্ট প্রকৃতির লোকের অন্তঃকরণে কুবাসনার উদয় হয়। জন্মান্তরে, জীবগণ সদসৎ বা মিশ্র যে কর্ম্মই দৃঢ়তা সহকারে অনুষ্ঠান করে, তাহাদের অন্তঃকরণে তদনুরূপ দাগ লাগিয়া যায় অর্থাৎ তাহাদের সেই সেই ভাবের সংস্কার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি গঠন করে। এজন্মে সেই প্রকৃতি হইতে বিভিন্নরূপের বাসনা সকল জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

সংসর্গ ও শিক্ষার ভেদে সকলে আপন আপন বাসনার ঠিক অনুরূপ কর্ম্ম না করিয়া, কিয়ৎ পরিমাণে ব্যত্যয় করিয়া থাকে। জন্মান্তরীয় সংস্কারটী এজন্মের শিক্ষা ও সংসর্গ দ্বারা প্রতিহত হয়, তখন সংস্কার ও শিক্ষা এবং সংসর্গ এই তিনের মিশ্রণে এক অভিনব প্রকৃতি গঠিত হইয়া থাকে। জন্মান্তরীয় স্বভাবই মূল, শিক্ষা ও সংসর্গ তাহার সহায় হয়। ফলতঃ সকলেই জন্মান্তরীয় সংস্কার দ্বারা গঠিত প্রকৃতি দ্বারা চালিত হইতেছে। এইরূপে ইহজন্মে কর্ম্ম দ্বারা নূতন সংস্কার অর্জ্জন করিতেছে।

অতএব কর্ম্মের কারণ বলিতে হইলে, পূর্ব্ব সংস্কার অর্থাৎ পূর্ব্বতন সংস্কার দ্বারা গঠিত প্রকৃতিকেই হেতু বলা যায়। এই ভাবে কর্ম্ম হইতে সংস্কারের উৎপত্তি, সংস্কার হইতে নূতন কর্ম্ম এবং সেই কর্ম্ম হইতে পুনরায় সংস্কার অর্জ্জন হইতেছে। কর্ম্ম আগে কি সংস্কার পূর্ব্বে, এ কথার উত্তর দেওয়ার উপায় নাই। কর্ম্ম ও সংস্কার, বীজ ও বৃক্ষের ন্যায় অনাদি প্রচলিত আছে। যেমন জগৎ অনাদি, তেমন আমরা অনাদি, তেমন কর্ম্ম ও সংস্কার অনাদি না হইয়া পারে না।

আমরা চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বময় দেহে পূর্ব্ব সংস্কার দ্বারা চালিত হইতেছি। ইহজন্মে বাসনা দ্বারা যে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকি তাহাকে পুরুষকার বলে; আর পূর্ব্বজন্মকৃত যে সকল কর্ম্মের ফল আমার দেহ মধ্যে স্বতঃ প্রকাশ পাইতে বাধা পায়, তাহা অন্যদ্বারা বা নিজের মধ্যেই অনিচ্ছাতঃ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে দৈব কর্ম্ম কহে। মহাভারতে ভীষ্ম দৈবাপেক্ষা পুরুষকারের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাহার কারণ এই, যে দৈব ও পুরুষকার উভয়ই যখন আমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের বলে অনুষ্ঠিত হয় তাহার মধ্যে পুরুষকার আমার হস্তগত, কিন্তু দৈব হাত ছাড়া হইয়াছে। দৈব আমার অনুকূল কি প্রতিকূল, তাহা উপস্থিত না হইলে বুঝিতে

পারি না, তাহা উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে দেখা যায় না, এজন্য তাহাকে অদৃষ্ট বলিয়া থাকে।

অদৃষ্ট দৈব, যখন দৃষ্ট হয়, তখন তাহার প্রতীকার না করিয়া হাত পা ছাড়িয়া দেওয়া কাপুরুষের কর্ম্ম। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—যদি প্রতিকূল দৈব উপস্থিত হয় তবে পুরুষকার দ্বারা অন্য কোন দৈব সাধন করতঃ, তাহার খণ্ডন করা যাইতে পারে।

দৈবও যখন আমারই জন্মান্তরীয় কর্ম্ম দ্বারা আগত হয়, তখন আমার এক্ষণকার কর্ম্ম দ্বারা, তাহা রহিত বা পরিবর্ত্তিত না হইবে কেন ?

অতএব আমি ইচ্ছা করিয়া দৈবদুর্ঘটনা অতিক্রম করিতে পারি। কিন্তু সেই ইচ্ছাটি কোথা হইতে আসিবে ? এই বিষয় চিন্তা করিলে তাহারও মূলে, পূর্ব্ব কর্ম্মজনিত সংস্কারকেই কারণ দেখা যাইবে। এই জন্য সকলের পক্ষে তেমন ইচ্ছার উদয় হইতে পারে না।

সাংখ্যে চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বময়ী প্রকৃতি দ্বারা সকল কর্ম্মানুষ্ঠান ও বিশ্ব-রচনা প্রদর্শিত হইয়াছে। শাস্ত্রান্তরে প্রকৃতিরে কর্ম্মময়ী বলিয়া ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কর্ম্ম ও প্রকৃতি উভয়ই কৃধাতুমূলক-ভাব-বাচ্যের-পদ সুতরাং একার্থ না হইবে কেন ?

এক প্রকৃতি হইতে যেমন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, তেমন আমরাও প্রকৃতি হইতে জাত। আমাদের প্রত্যেক কার্য্য প্রকৃতি দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। সকলেই বলে—"সৎপ্রকৃতির লোক সৎকর্ম্ম করে আর দুষ্ট স্বভাবের মনুষ্য কুকায করিয়া বেড়ায়।"

এই প্রকৃতি বা স্বভাবের মধ্যে নানাজাতীয় ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মোৎপত্তির বীজ নিহিত থাকে। তাহাদিগকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয় ; যথা—১ম অবিদ্যা, ২য় অস্মিতা, ৩য় রাগ (আসক্তি), ৪র্থ দ্বেষ ও ৫ম অভিনিবেশ।

(১) অবিদ্যা—আমি কে ? বা কি বস্তু ? এই তত্ত্ব যথার্থ ভাবে না জানার—নাম অবিদ্যা। আমরা যে আপনার স্বরূপ বিদিত নহি ইহার কারণও সেই অবিদ্যা। সাংখ্যের ২৪শ তত্ত্বকে অবিদ্যা বলা যায়।

(২) অস্মিতা—অবিদ্যা হইতে অস্মিতা জন্মে। আমি কি পদার্থ এই তত্ত্ব অবিদিত থাকাতে, ভিন্ন বস্তুর প্রতি আমি ভাব স্থাপন করিয়া আসিতেছি। ইহাকে অহঙ্কার তত্ত্বস্বরূপ বলা যাইতে পারে। এই অস্মিতা নিবন্ধন আমরা পঞ্চভূতনির্ম্মিত স্থূলশরীরকে আমি বলিয়া মনে করি। অনেকে মনকে আমি (আত্মা) বলিয়া বিবেচনা করে। এই শরীর ও মন আমি নই—এগুলি আমার ; আমি ইহা হইতে পৃথক্ পদার্থ। ফলতঃ প্রকৃতি ও পুরুষের মিশ্রিত ভাবটীর আরম্ভকে অস্মিতা বুঝিতে হয়।

(৩) রাগ (অনুরাগ)—ইহা অস্মিতা হইতে উৎপন্ন হয়। দেহের প্রতি অস্মিতা (আমি ভাব) স্থাপন হওয়াতেই দেহের অনুকূল স্ত্রী পুত্র মান সম্পত্তি প্রভৃতির প্রতি রাগ (আসক্তি) জন্মিয়া থাকে। ইহার জন্য জীবগণ চিরকাল সেই দিকে ধাবিত থাকে। রাগ বলিতে বাঙ্গালা ভাবাতে ক্রোধ বুঝা যায়, কিন্তু সংস্কৃত রাগ অর্থ—আসক্তি। পাতঞ্জলি বাসনা, তৃষ্ণা ও লোভ প্রভৃতিকে ইহার অন্তর্গত ধরিয়াছেন। যিনি ধার্ম্মিক বলিয়া অস্মিতা লাভ করেন তাঁহার দান তীর্থাদি পুণ্যকর্ম্মে অনুরাগ হয়। যাহারা আপনাকে নট বলিয়া ভাবে তাহাদের অভিনয়াদির প্রতি আসক্তি জন্মে।

(৪) দ্বেষ—আসক্তির (রাগের) বিঘ্ন হইলেই দ্বেষ (ক্রোধ বা ঈর্ষা) ভাব উৎপন্ন হয়। অতএব রাগই দ্বেষের জন্মদাতা। আমার প্রিয় বিষয়ের ব্যাঘাত যদ্দ্বারা সাধিত হয়, সেই ব্যাঘাতককে খর্ব্ব করার

জন্য যে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাই দ্বেষ শব্দের বাচ্য। জগতের যাবতীয় শত্রুতা দ্বেষ দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়।

(৫) অভিনিবেশ—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ ও দ্বেষ দ্বারা আমি ও আমার বলিয়া যে এক দৃঢ় সম্বন্ধ ভাব সংস্থাপিত বা বদ্ধ মূল হইয়া উঠে তাহার নাম অভিনিবেশ। তাহার বিনাশাশঙ্কা ঘটিলে চকিত ও ত্রস্ত হইতে হয় এ গুলি অভিনিবেশের কার্য্য।

ফলতঃ একমাত্র অবিদ্যা হইতে পরম্পরা ক্রমে অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ জন্ম গ্রহণ করে। *

এই পাঁচভাব প্রকৃতিগত হওয়াতেই জীবের বিভিন্ন কার্য্যানুষ্ঠান করিতে হয়। উহাদের মাত্রার তারতম্যানুসারে ভালমন্দ ও মিশ্রকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

এই অস্মিতা রাগ দ্বেষ ও অভিনিবেশের মধ্যেই দয়া, ধর্ম্ম, প্রেম, ভক্তি, সুখ, দুঃখ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য প্রভৃতি নিহিত বুঝিতে হইবে।

প্রণিধান করিলেই বুঝা যায় যে জীবের হৃদয়ে এই সকল বিবিধ ভাব একসময়ে সমভাবে অবস্থান করিতে পারে না। পরস্পর কাটাকাটি ঘটিয়া থাকে। এইরূপে ঘাত প্রতিঘাত দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বৃত্তিগুলির যে যে অবস্থা ঘটে, পাতঞ্জলির যোগশাস্ত্রে তাহা বর্ণিত রহিয়াছে। তদনুসারে মোটের উপর বৃত্তিগুলির চারিপ্রকার অবস্থা জানা যায় যথা—

---

* অবিদ্যা হইতে সংসারের উৎপত্তি; বিদ্যা দ্বারা লয় ঘটে। তত্ত্ব বিচার দ্বারা আমি জড় জগতের অতীত ইত্যাকার জ্ঞান হওয়াকে বিদ্যা বলে। বিদ্যার উন্মেষ হইলে স্থূলদেহের প্রতি ধীরে ধীরে বিতৃষ্ণা ও সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীরের দিকে অন্তঃকরণের গতি হইতে থাকে। এতাদৃশ উদ্ধাভিমুখ প্রবাহকে বিদ্যাস্রোতঃ বলা যায়। চরমে তদ্দ্বারা অবিদ্যা নষ্ট হইয়া মুক্তি ঘটিয়া থাকে।

(ক) উদারাবস্থা, (খ) বিচ্ছিন্নাবস্থা, (গ) প্রসুপ্তাবস্থা, ও (ঘ) তনু অবস্থা।

(ক) উদারভাব—অস্মিতা রাগ দ্বেষ ও অভিনিবেশ, ইহাদের যখন যেটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া দেহকে চালনা করে, তখনকার জন্য সেই বৃত্তির এতাদৃশ প্রদীপ্তভাবকে উদারাবস্থা বলে। কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি যখন ভালবাসাপরায়ণ হই, তখন তাহার প্রতি রাগ (অনুরাগ বা দয়া কিম্বা প্রেম) উদার অবস্থায় আছে, বলা যায়।

(খ) একদিকে নিবিষ্ট হইলে অন্যদিক্ যে ছাড়া পড়ে, এই ছাড়া ভাবকে বৃত্তির বিচ্ছিন্নাবস্থা বলা যায়। রাম যখন বেশ্যাসক্ত হয় তখন তাহার স্বীয় পত্নীর প্রতি অনুরাগের বিচ্ছিন্ন ভাব ঘটে। রুসিয়াতে যখন নিহিলিষ্টদিগের রাজ দ্বেষ ভাব প্রদীপ্ত হয়, তখন অন্য রাজার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলে, নিহিলিষ্টগণ সেইদিকে মত্ত হইয়া উঠে, তদ্দ্বারা রাজদ্বেষ ভাব চাপা থাকিয়া যায়, তখন তাহাদের রাজদ্বেষ বিচ্ছিন্নাবস্থাপন্ন হয়। অধুনাতন যে সকল মনুষ্য ধর্ম্ম সাধন করার জন্য কাম, ক্রোধ প্রভৃতিকে দমন করিতে যত্ন করেন, তাঁহাদের সেই উদ্যমকে ঐ সকল বৃত্তির বিচ্ছিন্নাবস্থানয়নের চেষ্টা বলা যায়।

(গ) প্রসুপ্তাবস্থা—উদার ও বিচ্ছিন্নাবস্থা ভিন্ন, বৃত্তি সকল যখন কারণভাবে লুক্কায়িত থাকে তখন বৃত্তির প্রসুপ্তাবস্থা। শিশুদিগের মধ্যে স্ত্রীবিলাসাদি বৃত্তি প্রসুপ্ত অবস্থায় অবস্থান করে।

এই সকল বৃত্তি, সকলের মধ্যেই ন্যূনাধিক মাত্রায় বিদ্যমান থাকে। যাহার ধর্ম্মবৃত্তি বিচ্ছিন্ন বা প্রসুপ্তাবস্থায় থাকে, এদিকে অধর্ম্মপ্রবৃত্তি উদার ভাবে কার্য্য করে, তখন সেই লোককে অধার্ম্মিক পাপী বলা যায়। প্রথমাবস্থাতে অজামিলের ও জগাই মাধাইয়ের এই ভাব ছিল। আবার যখন উহার বিপরীত ভাব ঘটে তখন সেই ব্যক্তিকে ধার্ম্মিক

মহাত্মা বলা যায় ; অজামিল এবং জগাই মাধাইয়েরও শেষ জীবন ইহার উদাহরণ স্থল।

কোন কোন জীব এক জীবনে মহাপুণ্যাত্মা থাকিয়া জন্মান্তরে ঘোর পাপাত্মা হইয়া উঠে, অন্যেরা তাহার বিপরীত হয় ; মনুষ্যের মধ্যে ধনবত্তা ও দরিদ্রতা যেমন স্থূল দেহের অবস্থা, পাপপুণ্যপরায়ণতা তেমন সূক্ষ্ম দেহের অবস্থা বিশেষ বুঝিতে হয়। কারণ দেহে সমস্ত বৃত্তিই প্রসুপ্ত থাকে।

যখন প্রত্যেক ব্যক্তির স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই ত্রিবিধ শরীর বিদ্যমান আছে, তখন কেহই অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ বিহীন নহে। কাহার মধ্যে কোন কোন বৃত্তি প্রদীপ্ত বা উদার, কোন কোন বৃত্তি বিচ্ছিন্ন, অপর গুলি প্রসুপ্ত ভাবে থাকে। এই হিসাবে ধরিতে গেলে কাহাকে ভাল, কাহাকে মন্দ বলা যায় না।

(ঘ) তনু—যাঁহারা সাংখ্য বিদ্যাদ্বারা সমস্ত জগৎ সংসারকে বিশ্লেষণ পূর্ব্বক বিভক্ত করতঃ, তন্ন তন্ন করিয়া আত্মতত্ত্বানুসন্ধান পূর্ব্বক আপনার যথার্থ স্বরূপ বিদিত হইয়াছেন, তাঁহাদের অবিদ্যা নষ্ট হইয়া আত্ম বিদ্যা জন্মিয়া থাকে। অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ যখন অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অবিদ্যার নাশে তাহারা চিরকাল স্থায়ী থাকিতে পারে না। বৃক্ষের মূলদেশ ছেদন করিলে যেমন শাখা প্রশাখা দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে ও অবশেষে নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ ব্রহ্মবিৎ পুরুষের ঐ সকল ভাবও ক্রমশঃ তনু (ক্ষীণ) হইয়া বিনষ্ট হয়, আর পুনরায় উৎপন্ন হইতে পারে না। তখন ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি কর্ম্ম ও সংস্কারজনিত পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু ভোগ হইতে এককালে মুক্ত হইয়া যান। জ্ঞানবানদিগের ঈদৃশ মুক্তির পূর্ব্বে যে বৃত্তি সকল ক্ষীণ হইতে থাকে, তাহাকে তনু অবস্থা বলা যায়।

যাঁহাদের কর্ম্ম বা সংস্কার কিম্বা কথিত রাগ দ্বেষাদি তনু হইতে

থাকে, এতাদৃশ ব্রহ্মবিৎ মহাত্মা সংসারে অল্পই জন্মায়। তদ্ভিন্ন অন্যদের পক্ষে কর্ম্ম সকল তনু হইতে পারে না। কর্ম্ম দ্বারা নূতন কর্ম্মের সংস্কার জন্মানই সাধারণের ব্যবহার। সুতরাং অন্যদের কর্ম্ম তনু না হইয়া বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

অতঃপর সাধারণের আলোচনীয় অন্য প্রসঙ্গ করা যাইতেছে।

বৃক্ষজাত ফল সকল পুষ্ট করার উপযোগী রস, যেমন মৃত্তিকা হইতে আকৃষ্ট হইয়া গুঁড়ী ও শাখা প্রশাখার মধ্য দিয়া ফলমধ্যে নীত হয়, তেমন আমাদের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মকারিনী শক্তি সেই অব্যক্ত মূল হইতে উদ্ভূত হওতঃ ত্রয়োবিংশতত্ত্বময় দেহবৃক্ষের অভ্যন্তর দিয়া আগত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতেছে।

যাহার অন্তঃকরণ যে ভাবে গঠিত থাকে, সে তদ্দ্বারা ভাবানুরূপ কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। এই অন্তঃকরণ গঠনকে জন্মার্জ্জিত সংস্কার দ্বারা প্রকৃতি গঠন বলা গিয়াছে। ভিতরে পূর্ব্বজন্মকৃত সংস্কার ও বাহিরে শিক্ষাজনিত নব্য সংস্কার এই উভয়ে কাটাকাটি হইয়া, যে সংস্কার বজায় থাকে তদনুসারে কর্ম্ম করিতে হয়।

ইহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে, যথা যাঁহারা জন্মান্তরে হিন্দু হওয়ার উপযুক্ত সংস্কার অর্জ্জন করতঃ দেহত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারা হিন্দুর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। (অনেকে বলেন বিবি বেশান্ত মরিয়া হিন্দু হইবেন এবং সাহেব ঘেঁসা বাবুরা বিলাতে গিয়া জন্মগ্রহণ করিবেন।) এক্ষণকার অনেকে, এ জীবনে ম্লেচ্ছশিক্ষা দ্বারা ম্লেচ্ছোচিত সংস্কার অর্জ্জন করিতেছেন, কিন্তু যাহাদের মধ্যে হিন্দু সংস্কার বিশেষ প্রবল তাঁহারা অন্যদের মত ম্লেচ্ছশিক্ষা পাইয়াও ম্লেচ্ছ ভাবাপন্ন হন না; বরং হিন্দু সংস্কারের অনুশীলন করিয়া থাকেন। কেহ কেহ সামান্য শিক্ষা পাইয়াই হিন্দুয়ানী ছাড়িয়া দেন, ইহাঁদের মধ্যে জন্মান্তরের হিন্দু সংস্কার

অল্পমাত্রাতে ছিল বলিয়া এ জীবনের সামান্য শিক্ষাতেই তাহা টলিয়া যায়।

এজন্য শাস্ত্র সকল দেবলোকে যাওয়ার উপযুক্ত সংস্কার অর্জ্জন করিতে বলেন।

যং যং বাপি স্মরন ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমাপ্নোতি কৌন্তেয় সদাতদ্ভাব ভাবিতঃ॥

যেরূপ ভাব স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করা যায় মরণান্তে তাদৃশ ভাবসহকারে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। হে কৌন্তেয়! তুমি সর্ব্বদা পরমার্থ ভাবনা দ্বারা চিত্তগঠন করিতে যত্ন কর।

মৃত্যু সময়ে রোগাদি যন্ত্রণায় শরীর অবসন্ন হয়, তখন ইচ্ছা পূর্ব্বক স্বর্গীয় চিন্তা অবলম্বন করার সম্ভাবনা নাই। এজন্য চিরজীবন স্বর্গীয় ভাব অনুশীলন করা আবশ্যক; তাহা হইলে অভ্যাসবশতঃ (পীড়িতাবস্থা হইলেও) মৃত্যু সময়ে সদ্ভাব উদিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং তাহার পক্ষে স্বর্গ দ্বারা উন্মুক্ত হয়।

একারণ মৃত্যু সময়ে পবিত্র সংস্কারের বিকাশ করার জন্য বান্ধবেরা মুমূর্ষ ব্যক্তিকে গঙ্গাযাত্রা করায়, কেহ কর্ণে রাম নাম শুনাইতে থাকে।

পাতঞ্জলি বলিয়াছেন—

"তত স্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্বাসনানাম্।"

৮ম সূত্র, পাতঞ্জল দর্শন, কৈবল্য পাদ।

পাপ, পুণ্য ও মিশ্র এই ত্রিবিধ কর্ম্মের মধ্যে যে যেমন কর্ম্মে রত হয় তাহার তদনুরূপ লোক প্রাপ্তির উপযুক্ত বাসনাই অভিব্যক্ত হইতে থাকে।

যিনি একমনে বিষ্ণুর আরাধনা করেন, তাঁহার মধ্যে যমলোকে গমনের বাসনার বিকাশ না হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্তির উপযুক্ত সংস্কার

বিকাশ হওয়ার সম্ভাবনা। পুণ্যবতী বেশ্যাদিগের মধ্যে অপ্সরো-লোকে-গমনোপযুক্ত সংস্কার বিকাশ হইতে পারে। এইরূপ পাপীদের অধোগত-সংস্কার প্রদীপ্ত হয়। ফলতঃ হৃদয়ের খাটী ভাবটী আগামী-জন্মে বিকাশিত হইয়া থাকে।

এখানে তর্ক হইতে পারে সকলেই স্বর্গ গমনের বাসনা করিয়া থাকে, কেহই নরকগমনের বাসনা করে না, অতএব সকলেরই স্বর্গগতি হয় না কেন ?

উত্তর—আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাসনা হইতে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। যাহাদের যথার্থ স্বর্গ বাসনা উদয় হয়, তাহারা সেই বাসনা দ্বারা প্রেরিত হইয়া দান ও তীর্থযাত্রাদির অনুষ্ঠান করিয়া, স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। অন্যেরা যে স্বর্গবাসনা করে, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা বাসনাই নহে। যে বাসনা দ্বারা জীবগণ চালিত হয় না, তাহা খেয়াল মাত্র। সাধারণ লোকে স্বর্গগমনটীকে সখের বিষয় মনে করিতে পারে কিন্তু মরণের পরে স্বর্গে যাইব এই আশ্বাসে উপস্থিত ভোগসুখ পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রোক্ত স্বর্গ জনক কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় কি ?

(১মতঃ) তাহারা উপস্থিত সুখভোগের সুযোগ ছাড়িতে প্রস্তুত নহে। (২য়তঃ) পরকালের প্রতি তত আস্থাবান্ নহে। (৩য়তঃ) বেদের প্রতি নিষ্ঠা নাই—বেদবিহিত কর্ম্মই পুণ্য অর্থাৎ স্বর্গ জনক হইতে পারে, বেদ বহির্ভূত ক্রিয়া দ্বারা স্বর্গলাভের সম্ভাবনা নাই। এক্ষণকার লোকেরা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার ধার ধারেনা, যাহা তাহাদের বুদ্ধিতে উচিত বোধ করে তাহাতেই প্রবৃত্ত হয়। এতাদৃশ অবলম্বনহীন মনুষ্য দিগের মরনান্তেও নিরালম্ব অবস্থা প্রাপ্তি অর্থাৎ পুনর্জ্জন্মের পরিবর্ত্তে প্রেতত্ব সংঘটিত হয়।

এখানে এ কথা দেখান গেল যে শাস্ত্রমতে কলিতে মরণান্তে প্রেতত্ব

ঘটে অর্থাৎ কলির মনুষ্য মরণের পরবর্ত্তী সময়ের জন্য প্রেতত্ব সংঘটনের উপযুক্ত সংস্কার সংগ্রহ করিয়া মরিয়া যায়।

এ ব্যবস্থা যেমন হিন্দুর প্রতি, তেমন অহিন্দুর প্রতিও প্রযুজ্য হয়। বিশেষতঃ অহিন্দুরা "মরিয়া ভূত হইব" এই ভাবের প্রেতত্ব প্রাপ্তির বাসনাদ্বারা চিত্ত গঠন করে। শিক্ষিতভাবাপন্ন হিন্দুরা যদিও প্রকাশ্য ভাবে তেমন কথা বলেন না (স্বর্গ নরক বা পুনর্জ্জন্ম ইহার একটা হইবে বলিয়া থাকেন) তথাপি তাহাদের অন্তরটা অহিন্দুভাবে গঠিত হওয়াতে হিন্দুদের ও অহিন্দুর ন্যায় প্রেত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এজন্যই হিন্দু আদ্যশ্রাদ্ধ অবধি ষোলটী শ্রাদ্ধ ও গয়াতে পিণ্ড দান করিতে ব্যস্ত হন।

আমরা সদসদ্ বাসনা দ্বারা পুণ্যপাপ কর্ম্মকরতঃ সংস্কার অর্জ্জন করি। সেই সংস্কার বীজস্থানীয় হইয়া নূতন দেহরূপ বৃক্ষ উৎপাদন করে। এই সংস্কার অর্জ্জিত হয়—সূক্ষ্মদেহ মধ্যে ; অবস্থান করে—কারণ শরীরে। সেই কারণ ও সূক্ষ্মদেহের পরিণতিই—আমাদের স্থূল-দেহ। সাংখ্য বিদ্যাদ্বারা এতাদৃশ পরিণতির বিজ্ঞান জানাযায়। সাংখ্য-বিদ্যার বহির্ভূত কোন ঈশ্বর নাই। সাংখ্যের পুরুষই ঈশ্বর ; আর চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বময়ী প্রকৃতিকেই—তাঁহার স্বভাব বা শক্তি অথবা কার্য্য বলিয়া ধরিতে হয়। সাংখ্যবিদ্‌গণ পুরুষকে ঈশ্বর ও প্রকৃতিকে ঐশী শক্তি বলিয়া মান্য করেন এজন্য তাঁহারা অন্য ঈশ্বর মানেন না। অজ্ঞগণ না বুঝিয়া মনে করে সাংখ্যেরা নাস্তিক। অজ্ঞেরা ঈশ্বর নাম দিয়া একজন অজ্ঞাত কর্ত্তার কল্পনা করে। বিজ্ঞেরা কি তাহাতে তৃপ্ত থাকিতে পারেন ? * তাঁহারা ঈশ্বরকে দ্বিখণ্ড করিয়া পুরুষ (শক্তিমান)

---

* কপিল "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" বলিয়া তাদৃশ ঈশ্বর ত্যাগ করতঃ— 'ঈদৃশেশ্বরঃ সিদ্ধঃ।" সূত্রে আত্মাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন। পাতঞ্জলি "ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা" বলিয়া বিকল্পে ঈশ্বরের স্বরূপ অবগত হইতে উপদেশ করিয়াছেন।

ও প্রকৃতি (ঐ শীশক্তি) এই দুই ভাগ করিয়া ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব বিচার করেন। এই উপায়ে আমরা স্বীয় কর্ম্মদ্বারা যেরূপে নূতন দেহে নূতন সংসারে প্রবেশ করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি তাহার বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছেন। পাতঞ্জল যোগসূত্রের কৈবল্যপাদের ২য় ও ৩য় সূত্র যথা— জাত্যন্তর পরিণামঃ প্রকৃত্যা পূরাৎ ॥ ২ ॥ সূত্রং

ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম ক্রিয়া হইতে যে সংস্কার অর্জ্জিত হয় সেই সংস্কার দ্বারা চালিত প্রকৃতি (স্বভাব) ই—পুণ্যবানের দেবদেহ ও পাপীর নারকীয় শরীর যোজনা করিয়া দেয়।

যদি বল প্রকৃতি দ্বারা সকলে চালিত হইয়া থাকে সেই প্রকৃতিকে জীবের অর্জ্জিত সংস্কার কিরূপে চালাইবে ? তদুত্তরে বক্তব্য—

নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তুততঃ ক্ষেত্রিকবৎ ॥ ৩ সূত্রং ॥

বাস্তবিক ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্য দ্বারা প্রকৃতিরে চালনা করিয়া স্বর্গ নরক গঠন করা হয় না, স্বভাবের মধ্যে যে স্বর্গ নরক ভাব নিহিত রহিয়াছে, পুণ্য পাপ কর্ম্মদ্বারা তাহা বিকাশ পাওয়ার উপযুক্ত পথ করিয়া দেওয়া হয় মাত্র। কৃষকেরা যে নালা কাটিয়া উচ্চভূমি হইতে অপেক্ষাকৃত নিম্নতর ক্ষেত্রে জল আনয়ন করে, তাহারা জলকে চালনা করে না সেই উচ্চ স্থানের জল, ক্ষেত্র পর্য্যন্ত পঁহুছিবার পক্ষে মধ্যস্থলে যেসকল উচ্চতাজনিত বাধা পায়, তাহাই নালা কাটিয়া সরাইয়া দিয়া থাকে, তখন জল স্বতঃ আসিয়া কৃষকের ক্ষেত্র প্লাবিত করে। সেইরূপ জীবগণের চির প্রচলিত প্রকৃতি মধ্যে দেবত্ব বা নরকত্ব প্রাপ্তির উপযুক্ত সংস্কার অনাদি কাল যাবৎ বহুপ্রকারে অর্জ্জিত ও সঞ্চিত আছে। মনুষ্য জন্মে সেই সকল দেবত্ব বা নরকত্ব প্রকাশের যেসকল বাধা বিদ্যমান ছিল, ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম কার্য্য দ্বারা তাহা রহিত হইলেই তাহার দেবত্ব

বা নরকত্ব আবির্ভূত হয়। অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্য দ্বারা সংস্কার বিকাশের মুখ খুলিয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

পাঠকদিগের এই ভাবটী হৃদয়ঙ্গম করার জন্য একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। অনেক সময়ে এমন দেখা যায় যে,—দশজন লোক একত্রে ভোজন করিতে বসিলেন। একভাণ্ডের দধি সকলে আহার করিলেন; নয়জনের কোন অসুখ হইল না, দশম ব্যক্তি তদুপলক্ষে জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। জ্বর নিবারণের জন্য কিছু উগ্র ঔষধ ব্যবহার করিয়া পুনরায় আমাশয় পীড়াগ্রস্ত হইলেন।

এখানে দধি ভক্ষণ, যদি জ্বরের সাক্ষাৎ কারণ হইত তবে অন্য নয় জনেরও জ্বর হইতে পারিত। তাহা না হওয়াতেই বুঝা যায়—দশম ব্যক্তির শরীরে জ্বর ও আমাশয়ের পীড়ার বীজ বিকাশোন্মুখ হইয়াছিল, কোন প্রতিবন্ধকতা বশতঃ এতকাল কেহই প্রকাশিত হইতে পারিয়াছিল না। দধি ভক্ষণ দ্বারা জ্বরের প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হওয়াতে জ্বর দেখা দিল। যদি সেই দিন কোন কারণবশতঃ তাহাকে উপবাসী থাকিতে হইত, হয়ত তদুপলক্ষে আমাশয় ব্যাধির প্রতিবন্ধকতা রহিত হইয়া যাইত, সুতরাং ঐ দিনে জ্বরের পরিবর্ত্তে আমাশয় পীড়ার আবির্ভাব ঘটিত।

তাহাতেই পাতঞ্জলি বলিয়াছেন—দেবত্ব, মনুষ্যত্ব, বা নরকত্বজনক সংস্কার পূর্ব্বেই জীবদেহে সঞ্চিত থাকে, দধি ভক্ষণের ন্যায় পুণ্যাদি ক্রিয়া তাহার নিমিত্তমাত্র হইয়া জীবকে তদনুরূপ দেহ ধারণ করিতে বাধ্য করায়। অতএব পুণ্য পাপ প্রভৃতি কর্ম্ম, জীবের সূক্ষ্মদেহগত দেবতা মনুষ্য পশ্বাদিজনক সংস্কার বিকাশের বাধা সরাইয়া দেয়, প্রকৃতি তখন জীবের দেবদেহ বা নারকীয় শরীর নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।

ইহার উদাহরণ শাস্ত্রে পাওয়া যায়, যে কোন ব্যাধ না বুঝিয়া শিব-

রাত্রি তিথিতে উপবাস করার দরুণ স্বর্গগামী হইয়াছিল। এক্ষণকার লক্ষ লক্ষ লোক যে—শিবরাত্রির ব্রত করিতেছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই কি মরণান্তে স্বর্গগতি হইবে?

এতদ্ভিন্ন অন্য এক ব্রাহ্মণকুমার চুরি করার নিমিত্ত পিতা কর্ত্তৃক বাটী হইতে বহিস্কৃত হয়, সেই দিনে শিবচতুর্দ্দশী ছিল। ব্রাহ্মণ পুত্র সমস্তদিন অনাহারে থাকিয়া, সন্ধ্যাসময়ে কোন শিবমন্দিরে শিবরাত্রি উপলক্ষে বহুলোকের আনীত নৈবেদ্যাদি বিবিধ খাদ্যের সমাগম দর্শনে, তাহা চুরি করিয়া আহার করার অভিপ্রায়ে তথায় অবস্থান করে। সমস্ত রাত্রি ব্রতিগণ কথাবার্ত্তায় জাগরণ করিয়া রাত্রিশেষে নিদ্রাগত হইলে পর, ব্রাহ্মণপুত্র সুযোগ পাইয়া মন্দির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, কিন্তু ঘটনাক্রমে একজনের শরীরে পাদস্পর্শ হওয়াতে সে জাগরিত হইয়া সকলকে জাগাইয়া ছিল। চোর তখন বিফল মনোরথ হইয়া দ্রুতপদে পলায়ন করে। পাহারাওয়ালা পশ্চাদ্ধাবিত হয় এবং তাহাকে ধরিতে না পারিয়া বাণ ক্ষেপ করে। তাহাতেই ব্রাহ্মণের মৃত্যু ঘটে। তখন দিবাগমন হইয়াছিল। সুতরাং অজ্ঞাতভাবে তাহার পক্ষে শিব-রাত্রিতে উপবাস ও জাগরণ ঘটিয়াছিল। সেই পুণ্যে তাহার স্বর্গগতি হইল।

অন্য এক ব্যাধ নল চালাইয়া বক শীকার করার সময়ে, দৈবাৎ নিকটবর্ত্তী এক তুলসী বৃক্ষে সেই নল সঞ্চালনজনিত জলের ছিটানি পতিত হওয়াতে, তুলসী সেবাজনিত পুণ্যে ব্যাধের স্বর্গলাভ হয়। সেই জন্য যাহারা তুলসীকে জল দিবে তাহাদের সকলেরই দেবত্ব প্রাপ্তি অবধারণ করা যায় না। উপরোক্ত স্থলে স্বর্গ গমনের প্রতি দুইটী কারণের সম্ভাবনা দেখা যায়; প্রথমতঃ—উহাদের স্বর্গ গমনের উপযুক্ত সংস্কার পূর্ব্বেই সংগৃহীত ছিল, অন্তরায় বিশেষ দ্বারা জীবমানে বিকাশ

হওয়া স্থগিত ছিল। তাদৃশ অজ্ঞাত পুণ্যদ্বারা সেই অন্তরায় কাটিয়া যাওয়াতে, দেবযোগ্য সংস্কার বিকাশ হইয়া দেবদেহ সংঘটিত হইয়াছে। অন্যদের যদি তাদৃশ স্বর্গপ্রদ সংস্কার সেইক্ষণে বিকাশোন্মুখ না থাকে, তবে সেই উপবাসাদি করিলে বর্ত্তমান দেহপাতে স্বর্গগতি না হইয়া পরবর্ত্তী জন্মের জন্য সঞ্চিত থাকিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ—ব্রাহ্মণ কুমার শিবরাত্রির ব্রতকরার পরে অন্য কোন পাপানুষ্ঠান করিতে অবকাশ পায় নাই। (নৈবেদ্যও চুরি করিতে পারিয়াছিল না) মরণকালে তাহার ব্রতজনিত পুণ্য সংস্কার উদারভাবে থাকাতে, যেমন তাহার স্বর্গগতি সংঘটন হইতে পারিল, অপর ব্রতীদিগের তেমন সম্ভাবনা কোথায়? অন্যেরা ব্রত করার পরে প্রচুর পাপানুষ্ঠান করিয়া পাপজনিত সংস্কার প্রদীপ্ত করতঃ তনুত্যাগ করিতে পারে। তাহা হইলে মরণান্তে তাহাদের সেই উদারাবস্থাপন্ন পাপজনিত সংস্কারের কার্য্য অব্যবহিত পরজন্মে বিকাশ পাইবার কথা। সেই সংস্কারের বেগ রহিত হইলে, পুণ্যসংস্কার ফলপ্রসূ হইতে পারে। এজন্য কেহ প্রথম জীবনে পাপী থাকিয়া শেষ জীবনে পুণ্যানুষ্ঠানে তৎপর হয়; আবার অনেকে তাহার ঠিক বিপরীত হইয়া থাকে।

শাস্ত্রাদিতে অনেকস্থলে ক্ষুদ্র পুণ্য করিয়া প্রচুর ফল পাইতে দেখা যায়, আবার বিশিষ্ট পুণ্যের তেমন ফল বুঝা যায় না। সেই সকল স্থানে শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা না বুঝিয়া, উপরোক্ত কোন হেতুর সদ্ভাব মনে করা উচিত।

ঋচীক মুনি এক হাঁড়ী ছাতু দান করিয়া স্বর্গে গেলেন, বলিরাজা ত্রিভুবনদান বিষ্ণুতে অর্পণ করিয়াও পাতালে যাইতে বাধ্য হইলেন। এগুলি উহার উদাহরণ স্থল।

তাহাতেই বলা গেল পুণ্য ও পাপ কর্ম্মফল জীবের প্রকৃতিগত

সংস্কার বিকাশের অন্তরায় দূর করিয়া দেয় মাত্র। জীব স্বীয় প্রকৃতগত সংস্কারানুসারে দেবদেহ, মানবদেহ বা নারকীয় দেহ ধারণ করে।

এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে—রাজর্ষি ভরতের মধ্যে হরিণোচিত সংস্কার পূর্ব্বেই বিকাশোন্মুখ ছিল মনুষ্যজন্মের নানা প্রতিবন্ধকতানিবন্ধন, তাঁহাকে হরিণরূপে পরিণত করিতে পারিয়াছিল না। যখন মনুষ্য জন্মের অবসান হইল ও পোষিত হরিণ শিশুর চিন্তা (পাপ) দ্বারা অন্যান্য প্রতিবন্ধক তিরোহিত হইল অমনি তাঁহার অন্তর্নিহিত মৃগ-জাতীয় সংস্কার প্রবল হইয়া তাঁহাকে হরিণযোনিতে প্রবেশ করাইল।

এতদুপলক্ষে তর্কিত হয়, যে হরিণ জন্ম ধারণ করিয়া পূর্ব্বতন মনুষ্য জন্মের অভ্যাস বশতঃ, তাঁহার পক্ষে (ঘাস খাওয়ার প্রবৃত্তি না জন্মিয়া) অন্ন ভক্ষণের প্রবৃত্তি হওয়া ও পশু সংসর্গ ত্যাগ করিয়া মনুষ্য সংসর্গে অনুরক্তি হওয়া উচিত ছিল। তেমন ত দেখা যায় না—ভরতের ন্যায় পূর্ব্ব জন্মে এক জাতীয় জীব থাকিয়া, অব্যবহিত পরবর্ত্তী জন্মে অন্য জীবরূপে জন্মগ্রহণ অনেকের ভাগ্যেই ঘটিতে পারে; কিন্তু সকল জীব যে জাতিতে জন্মে, সেই জাতীয় জীবের ব্যবহারেরই অনুসরণ করে কেন? কোন প্রাণীই ত ইহার অন্যথা করে না।

এতদুত্তরে ভগবান্ পাতঞ্জলি বলিয়াছেন—

"জাতিদেশকালব্যবহিতাণামপ্যানন্তর্য্যং স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ॥৯॥"

বিভূতিপাদঃ।

অনাদি সৃষ্টি প্রবাহে ভরতাদির ন্যায় মহাত্মগণের অসংখ্য বার হরিণ ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ভরতের শেষবারে হরিণ জন্মগ্রহণের লক্ষ জন্ম পূর্ব্বেও যদি হরিণ জন্ম হইয়া গিয়া থাকে, তবে শেষ হরিণজন্মের সময়ে সেই লক্ষ জন্মের পূর্ব্বতন হরিণ

জাতীয় সংস্কারই প্রাদুর্ভূত হইবে। মধ্যবর্ত্তী অন্যান্য জাতীয় সংস্কারের উদয় হইবে না। সেই পূর্ব্বতন হরিণজন্ম, শেষ হরিণজন্ম হইতে যত বিভিন্নজন্ম বা যত দেশ বা যতকাল ব্যাবধানেই ঘটিয়া থাকুক না কেন, উভয় হরিণ জন্মের সংস্কার ও স্মৃতি একরূপ থাকাতে মধ্যবর্ত্তী সমস্ত প্রকার ব্যবধান অতিক্রম করিয়া কেবল হরিণজন্মগত ভাবই পরবর্ত্তী হরিণজন্মে অভিব্যক্ত হয়, অন্যান্য জন্মগত সংস্কারগুলি চাপা থাকিয়া যায়। এইরূপ হয় কেন? বুঝিতে হইলে আমাদের এজন্মের খণ্ড খণ্ড কার্য্যগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেও বুঝা যাইতে পারে। মনে কর তুমি দশবৎসর পূর্ব্বে সেতার বাদ্য শিক্ষা করিয়াছ। তাহার পরে তবলা ও মৃদঙ্গ বাজান অভ্যাস করিলে, ইহার পরে ইংরেজি লেখা পড়া শিখিয়াছ। এখন যদি সেতার বাজাইতে আরম্ভ করিয়া অন্যমনস্ক হও তথাপি তোমার হস্ত দ্বয় সেই দশবৎসর পূর্ব্বকার সংস্কার ও স্মরণ দ্বারা চালিত হইয়া, সেতারের গৎই বাজাইতে থাকিবে, কিন্তু পরবর্ত্তী তবলা ও মৃদঙ্গ বাজাইবার সংস্কার বশতঃ তাল বাজাইয়া ফেলিবে না, কিম্বা ইংরাজী লিখার সংস্কার বশতঃ কিছু লিখিয়া ফেলিবে না। এই সকল বিভিন্ন সংস্কারগুলি তখনকার জন্য চাপা থাকিয়া যাইবে।

একজাতীয় জীব যে অন্যজীবে পরিণত হয়, তাহা জীবের সংস্কার দ্বারা গঠিত অন্তর্নিহিত প্রকৃতি বা স্বভাববিশেষের স্ফুরণমাত্র। নাট্যালয়স্থ অভিনেতাদিগের ন্যায় কোন তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা সজ্জিত হইয়া নূতনজীবরূপে পরিণত হইতে হয় না। ধাত্রীরা যেমন সন্তান প্রস্তুত করিয়া দিতে পারে না, গর্ভস্থ সন্তানের প্রসবক্রিয়ার সাহায্যমাত্র করিয়া থাকে, তেমন জীবের পুণ্যও পাপকর্ম্ম সকল, দেবদেহ কিম্বা নারকীয় শরীর ধারণের সহায় বা নিমিত্ত কারণ, জীবের পূর্ব্বসংস্কার জনিত স্বভাব বা প্রকৃতিই যথার্থ বিধাতা।

এই সূত্রগুলি যেমন মরণান্তে ভিন্নজাতীয় দেহ ধারণ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়, তেমন জীবমানে যে মধ্যে মধ্যে মনুষ্যের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়, তাহাও এইসকল বিধানানুসারেই ঘটিয়া থাকে।

যাহারা বাল্যে, পৈতৃকধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সন্ধ্যাপূজা ও দেবদ্বিজ-ভক্তির অনুশীলন করিত, তাহারা স্কুল কলেজে গিয়া ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইয়া উঠে। এখানে বুঝা যাইতেছে, রাজর্ষি ভরতের মধ্যে যেমন বহু জন্মার্জ্জিত মৃগজাতীয় সংস্কার বিকাশোন্মুখ হইয়া, প্রতিবন্ধকতা বিশেষ দ্বারা পূর্ব্বে অভিব্যক্ত হইতে পারিয়া ছিলনা, বর্ণিত বালকদিগেরও তেমন জন্মার্জ্জিত বিকাশোন্মুখ ম্লেচ্ছ সংস্কারগুলি, নিজগৃহে হিন্দুপরিবার মধ্যে প্রবল হইতে পারিতনা, পরে ভরতের হরিণচিন্তার ন্যায় ম্লেচ্ছসংসর্গদ্বারা উত্তেজিত হইয়া অভিব্যক্ত হইয়া থাকে।

আবার অনেকগুলি নব্য শিক্ষিত ব্যক্তি, যৌবনে যথেষ্ট ম্লেচ্ছাচার সাধন করিতে করিতে কোনরূপ আঘাত পাইয়া কিম্বা ম্লেচ্ছাচারের দুর্গতি দর্শন করিয়া অথবা কোন সজ্জনের সংসর্গ দ্বারা আপনাদের অন্তর্নিহিত বিকাশোন্মুখ হিন্দুভাবকে এতই প্রদীপ্ত করিয়া তোলেন, যে তাঁহাদিগকে আর সেই মানুষ বলিয়া চিনিবার উপায় থাকেনা। চারিদিকের লোকেরা তাঁহাদের হিন্দুয়ানী দেখিয়া অবাক্ হয় ও পরস্পর কাণাকাণি করে। এই সকল স্থলে লোকের নবজীবন তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা গঠিত হয় না ; তাহার নিজেরই প্রকৃতির বিকাশমাত্র, এই নিমিত্ত আমাদের পক্ষে নিজ প্রকৃতিগঠন করাই অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার।

অনাদি প্রচলিত প্রকৃতিরে আমরা কিরূপে গড়াইতে পারি ?—এখানে প্রকৃতিগঠন কথার ভাব এই যে,—অনাদিকাল যাবৎ আমরা কথনও দেবতা কথন মনুষ্য কথন বা নরকস্থ হইয়া আসিয়াছি। তদ্দ্বারা আমাদের সূক্ষ্মদেহের মধ্যে উত্তম মধ্যম ও নিকৃষ্ট সংস্কার সকল দাগ

লাগার ন্যায় রহিয়াছে। এজন্মে, উত্তম অর্থাৎ পুণ্য সংস্কার গুলির উন্মেষ করিতে যত্ন করিতে থাকিলে যদি তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি, তবে আর যত্ন করিয়া পুণ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইবেনা ; পূর্ব্বতন যে সকল জন্মে পুণ্যকর্ম্ম করিতে করিতে উৎকৃষ্ট সংস্কার সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছি, তখন তাহারাই উদারাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য করিবে ; সুতরাং নিকৃষ্ট সংস্কারগুলি বিচ্ছিন্ন ভাবাপন্ন হইয়া চুপ করিয়া থাকিবে। মরণ পর্য্যন্ত এই ভাব চলিতে থাকিলে, "মৃত্যুকালের ভাবানুসারে নূতন দেহ ধারণ ঘটে" এই নিয়মানুসারে মরণান্তে আমাদের দেবদেহপ্রাপ্তির জন্য স্বর্গ-গমন করিবার আশা আছে। এইরূপে যত্ন করিয়া উৎকৃষ্ট সংস্কার গুলিকে জাগরিত করাকে আমাদের সৎপ্রকৃতি গঠন বলা যায়।

এজন্য শাস্ত্রাধ্যায়ন, তীর্থগমন ও সজ্জনের সমাগম বিশেষ আবশ্যক। তাহাতেই বলে "সঙ্গগুণে রঙ্গ্ ধরেছে।" ম্লেচ্ছসংসর্গ, ম্লেচ্ছমতানুশীলন, ও ম্লেচ্ছগ্রন্থপাঠদ্বারা হিন্দু সন্তানেরও ম্লেচ্ছ রঙ্গ ধরিয়া যায়। অতএব সৎশিক্ষা না হইলে চলে না। এইসকল কার্য্যদ্বারা হৃদয় গহ্বরে নিহিত সাধুসংস্কার গুলিকে ভাসাইয়া তুলিতে হয়। এই প্রকারে প্রকৃতিকে প্রস্তুত করিয়া ভাবী মঙ্গল সাধন করিতে হয়। নতুবা যে ভাবের সংস্কার লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, সংসর্গ জনিত-ঘাত প্রতিঘাত দ্বারা তাহা আপনা আপনি এক অভিনব ভাব ধারণ করিয়া থাকে। তাহা পূর্ব্ব-তন কোন জন্মের সংস্কারের অনুরূপ হইয়া উঠিলেই তন্মধ্যে সেই জন্মের নৈপুণ্য সকল প্রকাশ পাইতে থাকে। এজন্য দেখা যায় অনেকসময়ে সৎপ্রকৃতির মনুষ্য, দুষ্ট লোকের সংসর্গে এমনই বনিয়া যায়, যে তখন তাহার পূর্ব্বজন্মের দুষ্ট স্বভাব হইতে এত নৈপুণ্য ও কুশলতা আবির্ভূত হইতে থাকে যে তদ্দ্বারা স্বদলস্থ সকল দুষ্টগণ হার মানিয়া থাকে।

সৎসংস্কার সম্বন্ধেও এই নিয়ম। অনেক সময়ে গুরু অপেক্ষা শিষ্যের

অধিক যোগ্যতা বিকাশ পাইতে দেখা যায়। এই সকল দেখিয়া প্রকৃতি গঠনরূপ পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। মরণান্তে ভিন্নজাতীয় দেহধারণ করার বিষয়েও একমাত্র ব্যক্তিগত প্রকৃতিই মুখ্যকারণ। প্রকৃতিরই কর্ত্তৃত্ব ক্ষমতা বিদ্যমান থাকাতে সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকৃতিকে সংখ্যা করিয়া বুঝাইতে যত্ন করা হয়।

সেই প্রকৃতিদ্বারা ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে এই সমস্ত জগৎ গঠিত হইয়াছে। সেই অভিব্যক্ত প্রকৃতির ভাব যত কাল পরিবর্ত্তিত না হয় ততকাল আমাদের ব্যষ্টিভাবে ব্যষ্টিদেহ রক্ষিত হইতেছে। এইভাবে বিরাট পুরুষের সমষ্টি দেহও রক্ষিত হয়, আমাদের সকলের দেহ বজায় থাকিলেই তাঁহার সমগ্রশরীর অক্ষুন্ন থাকে। পুনরায় যখন বর্ত্তমান ভাবের ব্যত্যয় ঘটিয়া, প্রকৃতিগত নূতন সংস্কারের উন্মেষ হইতে থাকে, তখন আমাদের নবজীবন লাভ হয়, অথবা পূর্ব্ব দেহ পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিনব দেহধারণ ঘটে। এইভাবে পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন ঘটিতে ঘটিতে যখন সমষ্টিদেহে (বিরাটপুরুষের) পরিবর্ত্তন সময়টা আগত হয়, তখন ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় সংঘটিত হইয়া থাকে।

ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়কাল আগত হইলে মহাপ্রলয়ের ন্যায় মৃত্তিকাতত্ত্ব জলতত্ত্বে এবং জলতত্ত্ব, তেজস্তত্ত্বে, এই রূপে পরপর ভাবে তেইশটী তত্ত্বের বিলয় সংঘটন হয় না। সেরূপ হইতে গেলে একজীবের মৃত্যুসময়ে সমস্ত জীবের দেহপাতঘটার সম্ভাবনা হয়। আমাদের মৃত্যু (ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডের লয়) কালে আমরা তত্ত্বগুলিকে লয় না করিয়া ক্রমে ক্রমে তত্ত্বগুলিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অব্যক্ত হইয়া যাই।

আমাদের পরিত্যক্ত দেহের মৃত্তিকাদি তত্ত্ব-সমূহ তখন বিরাট পুরুষের দেহ স্বরূপ পড়িয়া থাকে। জীবমানে আমার দেহটী যেমন আমার সম্পূর্ণ দেহ, তেমন বিরাট পুরুষের আংশিক দেহ স্বরূপ অবস্থান

করে। আমার মৃত্যু হইলে তাহা আমার দেহ থাকে না কিন্তু তখনও বিরাটশরীরের অংশত্ব তাহাতে বজায় থাকিয়া যায়। ক্রমে ক্রমে দেহটী নষ্ট হইয়া বিরাড়্দেহস্থ ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোমের সহিত মিশিয়া গিয়া থাকে।

মৃত্যু ও জন্মক্রম।

এ ব্যাপার বুঝিয়া উঠা সহজ কথা নহে। গীতাতে কথিত আছে—

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানম্বাগুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি, পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥"

জীব কিভাবে দেহ ছাড়িয়া যায় কিরূপে দেহে অবস্থান পূর্ব্বক ভোগ করে এবং কিরূপেই বা গুণের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; এবিষয় মূঢ় লোকেরা অনুভব করিতে অক্ষম; কেবল জ্ঞানচক্ষু দ্বারা জ্ঞানবানেরা দেখিয়া থাকেন।

সেই জ্ঞান চক্ষুটী বিকাশের জন্য এত কঠিন সাংখ্য বিদ্যার আলোচনা করিতে হইয়াছে। আমরা প্রথমাধ্যায়ে চব্বিশতত্ত্বের স্বরূপ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে পঞ্চকোষ ও ত্রিবিধ শরীরের বর্ণনা করিয়া অনর্থক পাঠকগণকে শ্রান্ত করি নাই। ঐ সকল তত্ত্ব ও কোষ এবং শরীরের অবস্থা পাঠকের অন্তরে চিত্রিত হইলেই পাঠক কি ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও কিরূপে মরিবেন এবং কিরূপেই বা পুনর্দ্দেহ ধারণ করিবেন, এসকল হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতে পারেন, নতুবা নয়।

চৈতন্য জড়ের সহিত মিশ্রিত হইয়া জীব হইয়াছে সেই মিশ্রিত ভাব বিশ্লেষণ (Analysis) কে মৃত্যু বলা যায়। আমরা প্রাণ নই,—জীব।

প্রাণ আমাদের জিনিষ। জীব প্রাণকে ত্যাগ করিলেই স্থূলও সূক্ষ্ম শরীর পরিত্যাগ করিলেন। অব্যক্তকারণ শরীরকে কখনও ত্যাগ করিতে পারেন না বরং মৃত্যুতে জীব, কারণশরীরে গিয়া অবস্থান করেন।

কারণশরীর অব্যক্ত। অজ্ঞলোকেরা সেই অব্যক্ত কারণশরীরের ভাব না বুঝাতে মৃত্যুতেই জীবের সমাপ্তি বুঝিয়া লয়। জ্ঞানিগণ তেমন মনে করেন না। তাঁহারা জানেন জীব মৃত্যুতে কারণশরীরে গিয়া স্থূল সূক্ষ্ম দেহ ছাড়িয়া দেয় এবং তথা হইতে ব্যক্ত জগতে পুনরাগত হয়। মূর্খের পক্ষে এই ভাব বোধগম্য হইতে পারে না। যে সকল মূর্খ তাদৃশ জ্ঞানীদিগের প্রবর্ত্তিত শাস্ত্রের অনুসরণ করে, তাহারা না বুঝিয়াও পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে একটা ধারণা পোষণ করিয়া থাকে। আর যে সকল ব্যক্তি কপিলাদি ঋষির ন্যায় জ্ঞানবান্ নহে এবং অজ্ঞ খাঁটি হিন্দুর ন্যায় নিষ্ঠাবান্ও নয়, তাহারা স্বাধীনভাবে মৃত্যুচিন্তা করিয়া কিছুই স্থির করিতে সমর্থ হয় না। এজন্য অনেকে মৃত্যুতেই জীবের শেষ হয়, ভাবিয়া থাকে।

বিদ্যুৎ যেমন মেঘের কোলে লুকাইয়া থাকিয়া ক্ষণে ক্ষণে বিকাশ পায়, জীবও তেমন কারণশরীরে গিয়া অব্যক্ত হওতঃ পুনরায় সূক্ষ্ম ও স্থূল জগতে আসিয়া থাকে।

আমাদের মত স্থূল দেহ ধারণ করিতে হইলে অগ্রে সূক্ষ্ম দেহ আশ্রয় করিতে হয়, এজন্য জীব এক স্থূল শরীর ছাড়িয়া, প্রাণের আশ্রয় ভিন্ন নূতন স্থূল শরীরে যাইতে সমর্থ হন না।

সাংখ্যতত্ত্ব দ্বারা মৃত্যু ও পুনর্জ্জন্মের প্রক্রিয়া বুঝিতে হইলে প্রথমে বিষয়টীকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া লইতে হয়; যথা—(১ম) প্রাণ-ত্যাগ, (২য়) প্রাণ বাহির হওয়া অর্থাৎ প্রাণ সহকৃত জীবের আতি-বাহিক দেহ ধারণ পূর্ব্বক পুনর্জ্জন্মগ্রহণের জন্য গমন, (৩য়) পুনর্জ্জন্ম।

(১ম) প্রাণত্যাগ,—বেদশাস্ত্রে "বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে" ইত্যাদি বাক্যে, এই বিষয়টী শ্রুত হওয়া যায়, সেই সকল শ্রুতিবাক্য সাংখ্যের সহ মিলাইয়া প্রকাশ করা যাইতেছে।

মৃত্যুর সময়ে প্রথমে বাক্ রোধ হইয়া যায়। তখন মনের ক্রিয়া চলিতে থাকে, নানারূপ বিভীষিকা দর্শন করিয়া ভীত ও কম্পিত হয়। তাহাতেই তখনও মনের সত্তা বুঝা যায়। আচার্য্যগণ বলেন বাগ্রোধ বলিতে বাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পরিত্যাগ বুঝিতে হয়। জীবমানে যে ইন্দ্রিয়দেবতাদের শক্তি লইয়া দেহ মধ্যে ব্যবহার করা হইত, মরণ সময়ে জীব, সেই সকল দেবতা দিগের ভিন্ন ভিন্ন শক্তিগুলি তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করেন। তখন স্থূল দেহ বিরাটের দেহস্থ পঞ্চভূতের সহিত মিশার ন্যায় ইন্দ্রিয় গুলি আপন আপন অধিষ্ঠাত্রী দেবতাতে মিশিয়া যায়।

ক্রমে মনঃও তাহার অধিদেবতাতে চলিয়া যায়। তখন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গমনাগমন চলিতে থাকে। সেই সময়ে শত চেষ্টা করিলেও আত্মীয়স্বজন ও ধন সম্পদের সম্বন্ধ তাহার অনুভব হয় না। ক্রমে ক্রমে প্রাণও শ্বাস প্রশ্বাস ব্যাপার রহিত করিয়া মহত্তত্ত্বে অবস্থান করে। পাঠক "তত্ত্বময়-সংসার বৃক্ষের" ছবির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিচার করিলে বুঝিবেন—যে স্থূল দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্মভূতময় তামসিক অহঙ্কার পরিত্যক্ত হইতে থাকে। শ্রবণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন পরিত্যক্ত হইলেই সাত্ত্বিক অহঙ্কারের প্রত্যাহার হয়, আর বাগাদি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় বিগমের পর, যখন প্রাণের বৃত্তি শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া রহিত হয়, তখন রাজসিক অহঙ্কারেরও প্রত্যাহার বুঝিতে হইবে। তৎকালে জীব মহত্তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান থাকে।

এই অবস্থায় যদিও প্রাণের ক্রিয়া—শ্বাস প্রশ্বাস বিলুপ্ত হয়, কিন্তু

তথাপি প্রাণত্যাগ হইয়াছে বলা যায় না। মহত্তত্ত্বই প্রাণের মুখ্য স্বরূপ। যতক্ষণ জীব মহত্তত্ত্বের সহিত সংসৃষ্ট থাকে ততকাল প্রাণত্যাগ করিয়াছে, বলা যায় কিরূপে? ফলতঃ স্থূল শরীরে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস রহিত হইলেও কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত তাহা স্পর্শ করিলে উষ্ণ বোধ হইবে। এই উষ্ণ লক্ষণ দ্বারা জীবের মহত্তত্ত্বে অবস্থান জানা যায়।

এক্ষণকার লোকে এতদূর বুঝে না, তাহারা শ্বাস প্রশ্বাসের গতিরোধ হইলেই মৃত্যু হইয়াছে মনে করে। গৃহের অভ্যন্তরে এতাদৃশ অবস্থা হইলেও "অমুক ঘরে মরিয়াছে" বলা যায় না। শরীর উষ্ণ থাকিতে থাকিতে বাহিরে আনা হিন্দু মাত্রেরই কর্ত্তব্য। নতুবা গৃহমধ্যে মৃত্যু হইলেই দুর্গতির সম্ভাবনা হয়।

পরে যখন মহত্তত্ত্বের সম্বন্ধও রহিত হয়, শরীরে উষ্ণতা লোপ পাইয়া যায়, তখন প্রাণ ত্যাগ ঘটে। তৎকালে জীব অব্যক্ত চতুর্ব্বিংশ তত্ত্বে প্রবেশ করে। ইহাকে মৃত্যু বলে।

এই সময়ে জীবের আত্মপর কিছুই বোধ হয় না সুষুপ্তবৎ স্বীয় কারণে লীন থাকিয়া যায়। এজন্য মৃত্যুতে জীবের শেষ হয় না। জীব তখন সংস্কারের কারণাবস্থাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। তখন জীব ঈশ্বরে বা কারণশরীরে অবস্থান করিতেছে বলা যায়। এই ভাবে প্রাণ ত্যাগের কথা বলা গেল। প্রাণত্যাগও প্রাণ বাহির হওয়া এক নয়। জীব যখন একাবধি মহত্তত্ত্ব (প্রাণ) পর্য্যন্ত তেইশটীতত্ত্বের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া অব্যক্ত হয়, তখন তাহার প্রাণত্যাগ বলা যায়। এইরূপে প্রাণ বা মহত্তত্ত্ব ত্যাগের পরে, যখন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় পুনরায় সেই সকল তত্ত্বে প্রবেশ করিয়া পুনর্জ্জন্ম গ্রহণের জন্য আতিবাহিক দেহ আশ্রয় করে, তখন প্রাণ বাহির হইল বলা যায় তাহার প্রক্রিয়া এইরূপ জানা গিয়াছে; যথা—

(২য়) প্রাণ বাহির হওয়া—প্রাণ ত্যাগের পর জীব স্বীয় কারণাবস্থায় লীন থাকিয়া কর্ম্মবশে পুনরায় প্রাণকে গ্রহণ করিয়া থাকে। সুষুপ্তি অবস্থাতে আমি ছিলাম কি না তাহাই বুঝা যায় না; তত্রাপি আমরা কাহারও বিনা চেষ্টাতে সুষুপ্তি হইতে জাগরিত হই কেন? এ কথার বিচার করিলে পূর্ব্ব সংকল্পিত কর্ম্মকেই জাগরণের কারণ বলিয়া ধরিতে হয়।

আমরা কেহই 'আর জাগরণ করিব না' এরূপ স্থির সংকল্প করিয়া নিদ্রা যাই না, সকলেই পুনরায় জাগরণের জন্য মন বান্ধিয়া ঘুমাইয়া থাকি, তদগতিকে আমাদের সুষুপ্তি হইতে স্বতঃ জাগরণ ঘটে। এই ভাবে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মজনিত সংস্কার থাকাতেই প্রাণত্যাগের পরে অব্যক্ত কারণ শরীর হইতে উত্থিত হইয়া মহত্তত্ত্বের অংশস্বরূপ (প্রাণ অপান সমান উদান ও ব্যান এই) পঞ্চবৃত্তি বিশিষ্ট প্রাণকে পুনরায় আশ্রয় করিয়া থাকি। ইতি পূর্ব্বে [৪৬ পৃষ্ঠাতে] সুষুপ্তি হইতে স্বপ্নদেহে প্রবেশ করার প্রসঙ্গ যেরূপ বলা গিয়াছে মৃত্যুর পরে প্রাণ ধারণও সেই প্রণালীতে ঘটিয়া থাকে। শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া শরীর শীতল হইয়া গেলে পরে কারণদেহ হইতে সূক্ষ্ম দেহে পুনরুত্থান ঘটে। তখন স্থূল শরীরের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ না থাকাতে, মৃতের পার্শ্বগত মনুষ্যেরা কোনরূপ পরীক্ষা করিয়াও এই বিষয়ের কোন সন্ধান জানিতে পারে না। কারণ, জীব তখন প্রাণেই প্রবেশ করিয়াছে; তখনও প্রাণ স্থূল দেহে প্রবেশ করে নাই, কাযেই দেহ পরীক্ষা করিয়া প্রাণ বা জীবের সত্তা কিছুই বুঝা যাইতে পারে না।

প্রাণ ত্যাগের প্রাক্কালে যখন ইন্দ্রিয় ও মন পরিত্যক্ত হয় (ইতি পূর্ব্বে বলা গিয়াছে), তখন নিঃশ্বাসের ও প্রশ্বাসের সঞ্চার দ্বারা প্রাণের সত্তা সুতরাং জীবেরও স্থিতি বুঝা যাইত, এখন দেহের সহিত তেমন

সম্বন্ধ নাই, বাহিরের লোকে বুঝিবে কিরূপে? যিনি মরিয়াছেন তিনি প্রাণের আশ্রয়ে থাকিয়া 'আমি আছি' এই পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন। আমরা নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিবার সময়ে, যেমন আমি নিদ্রিত আছি কি জাগরিত, এই বিচার করি না ও বুঝি না, তেমন মৃতব্যক্তিও তদবস্থায় আমি মৃত কি জীবিত একথা বুঝিতে পারে না। স্বপ্নে যেমন জাগরণের অবস্থা স্মরণ থাকে না, অনেক সময়ে আমার যে বিবাহ হইয়াছে, ছেলে মেয়ে আছে, এই ভাবও উদিত হয় না, বৃদ্ধ ও আপনার বাল্যাবস্থা দর্শন করে, তেমন মৃতব্যক্তিও জীবমানের ব্যবহার বিস্মৃত হইয়া যায়। কেবল যে সকল আচরণ সংস্কাররূপে প্রাণের ভিতরে দাগ্ লাগিয়া যায় তাহাই তাহার আগামী জন্মে বিকাশ হওয়ার জন্য সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'প্রাণময় কোষ' ব্যাখ্যা করিতে বলা গিয়াছে, যে জীর্ণ দেহ হইতে বাহির হইতে যত্ন করাও প্রাণের একরূপ কার্য্য। ইহাকে প্রাণের উদান বৃত্তি কহে।

বেদে একাদশ বৃত্তি বিশিষ্ট প্রাণকে একাদশ রুদ্র বলিয়া শুনা যায় রোদন করেন না এই অর্থে 'রুদ্' ধাতু হইতে রুদ্র পদ সিদ্ধ হইয়াছে। মহাভারতে রুদ্রস্তুতিতে কথিত আছে—"যে ন রুদন্তি দেহস্থা দেহিনো রোদয়ন্তি চ।" যাঁহারা দেহ হইতে বাহির হওয়ার সময়ে নিজেরা রোদন করিয়া যান না, কিন্তু বন্ধু বান্ধবদিগকে কাঁদাইয়া বাহির হন সেই রুদ্রদিগকে নমস্কার করি। শুক্ল যজুর্ব্বেদের বৃহদারণ্যকোপনিষদে, দেহ হইতে প্রাণ দেহান্তরে গমন করার সময়ে যে ভাবে গমন করে তাহার একটী উদাহরণ আছে যে, গৃহস্থেরা একবাড়ী ছাড়িয়া অন্য বাড়ীতে বাস্তব্য করিতে যাত্রা করিলে প্রথমতঃ একখানা গাড়ী বা নৌকা সংগ্রহ করতঃ তাহাতে গৃহকার্য্যের যাবতীয় উপকরণ উঠা-

ইয়া বাড়ীখানা খালি করিয়া প্রস্থান করে। সেইরূপ মৃতব্যক্তির প্রাণও জীবের সহিত পুনরায় মিলিত হইয়া আর সেই জীর্ণ দেহ স্বীকার করে না, সে আতিবাহিক দেহ সংগ্রহ করতঃ তাহাতে সূক্ষ্মদেহের সপ্তদশ অঙ্গ স্থাপন করে এবং জীবমানের যে সকল কর্ম্ম সংস্কার রূপে পরিণত হইয়াছে ও বেদানুগত যে গূঢ় বিজ্ঞান অর্জ্জন করা গিয়াছে, তাহা পুরাতন দেহ হইতে নূতন দেহের জন্য বোঝাই করিয়া লয় তাহার পরে জীবসংযুক্তপ্রাণ, তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক দেহান্তর গমন করে। এতৎ সম্বন্ধে উক্ত উপনিষদের অন্যত্র স্পষ্ট কথিত আছে প্রাণ দেহ ছাড়িয়া গমন করিলে পূর্ব্ব দেহার্জ্জিত বিদ্যা কর্ম্ম ও প্রজ্ঞা সঙ্গে গমন করিয়া থাকে। এখানে বিদ্যা বলিতে ম্লেচ্ছ ভাষা বা ম্লেচ্ছদিগের মতামত বুঝিতে হইবে না—তাহা অবিদ্যার অন্তর্গত। শাস্ত্রীয় বিদ্যা অন্যরূপ তাহার সামান্য প্রসঙ্গ [৬৫ পৃষ্ঠার] টীকাতে করা গিয়াছে।

মৃত্যুর অব্যক্তাবস্থা হইতে উত্থিত জীব, (১মতঃ) সূক্ষ্মদেহে প্রবেশ করে, তাহাতে সপ্তদশটী অঙ্গ থাকে যথা বুদ্ধি, মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র। এই সতেরটীর তাল পাকান ভাব অহঙ্কার তত্ত্বের স্বরূপ।

এই সপ্তদশ অঙ্গবিশিষ্ট সূক্ষ্ম শরীর, স্থূল ভূতে আবৃত না হইয়া মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতে পারে না। এজন্য সূক্ষ্ম দেহস্থিত পঞ্চতন্মাত্র হইতে, লঘুমাত্রাতে স্থূল ভূত সকল উৎপন্ন হইয়া আতিবাহিক দেহ গঠন করে। সেই আতিবাহিক দেহে জড়িত সূক্ষ্ম দেহই মাতৃগর্ভে গমন করিয়া থাকে। [১০৪ ও ১০৫ পৃষ্ঠা দ্রঃ।]

সকল আতিবাহিক দেহ, এক উপাদানে ও একভাবে রচিত হয় না। স্বর্গগামী ও অধোগামীদিগের আতিবাহিক শরীর বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। কলিযুগের অধিকাংশ মনুষ্যই মরণান্তে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়।

সেই প্রেতদেহকে আতিবাহিক দেহ বলা যায় না ;—কারণ, জীবগণ প্রেত দেহে আরোহণ করিয়া নূতন জন্মের জন্য অতিবাহিত (চালিত) হয় না। যে দেহ জীবকে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণের জন্য যানাদির ন্যায় অতিবহন করিয়া লইয়া যায় তাহাকেই আতিবাহিক দেহ বলিয়া থাকে। প্রেতের পুনর্জ্জন্ম হয় না। প্রেতদেহও পিতামাতা হইতে জন্মে না ; [৩৩ পৃষ্ঠা দেখ] অন্যান্য জীবিত দেহ আশ্রয় না করিলে প্রেতের ভোগশক্তি থাকে না। প্রেতত্বে জীবের বড় দুরবস্থা ঘটে। এজন্য হিন্দুগণ মৃতব্যক্তিদিগের প্রেতত্ব পরিহার করার জন্য ষোড়শ শ্রাদ্ধ, বৃষোৎসর্গ, ও গয়াশ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান করে। এইরূপে শ্রাদ্ধাদি দ্বারা প্রেত দেহ সকল আতিবাহিক দেহে পরিণত হইলেই, জীব তদ্দ্বারা পুনর্জ্জন্মধারণের জন্য স্বর্গ মর্ত্ত্য-বা নরকে গমন করিয়া থাকে।

যে সকল হিন্দুপ্রেত বা অহিন্দুপ্রেত উক্তরূপে আতিবাহিক দেহ প্রাপ্ত না হয়, তাহারা চিরকাল প্রেতত্ব ভোগ করিতে থাকে। জীবমানে যাহারা উত্তম বিদ্যার্জ্জন না করিয়া (অনেকে) প্রেত অবস্থাকেই স্বর্গ বলিয়া সংস্কার অর্জ্জন করিয়া গিয়াছে, তাহারা প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রেতত্বকেই স্বর্গভোগ মনে করে। এজন্য সংস্কারের তারতম্য অনুসারে কেহ "তৃতীয় স্বর্গে, কেহবা সপ্তম স্বর্গে আছি" বলিয়া প্রকাশ করিতে পারে। জগতের প্রলয়ের সময়ে বিরাট দেহের সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহাদের প্রেতদেহেরও বিলয় ঘটিবে তখনই তাহাদের প্রেতত্ব দূর হইবে। পরিশেষে নূতন সৃষ্টির সময় আপনাদের শুভাশুভকর্ম্মানুসারে স্বর্গে মর্ত্ত্যে বা নরকে তাহাদের পুনর্জ্জন্ম ঘটিয়া থাকে।

মরণের পরে, যাহারা আতিবাহিক দেহে মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণের জন্য আগত হয়, তাহাদেরই প্রক্রিয়া বলা যাইতেছে।

(৩য়) পুনর্জ্জন্ম—এই শ্রেণীর জীবেরা (২য়তঃ) বাষ্পাকার আতি-

বাহিক দেহ প্রাপ্ত হয়। সেই বাষ্প সকল যখন শীতল হইয়া শিশিরাকার ধারণ করে, তখন সেই শিশির বিন্দুগুলিই তাহাদের আতিবাহিক দেহ হয়। আবার (৩য়তঃ) সেই সকল শিশির, ধান্য, যব, গম, মুদ্গাদি ওষধির মধ্যে নিপতিত হইয়া সেই সকল ওষধি কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইলে জীব রস আকারে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করে। ওষধিগণ ফল প্রসব করিলে তাহারা ওষধির মধ্য দিয়া ধান্যাদির মধ্যে নীত হয়, এইরূপে ধান্যাদিতে রস স্বরূপ স্থিতিকেও আতিবাহিকাবস্থা বলিয়া বুঝিতে হইবে। আতিবাহিক অবস্থাতে জীবিতাবস্থার ন্যায় সুখ দুঃখ বোধ হয় না। জীব তখন তন্দ্রাগত ব্যক্তির ন্যায় ঐ সকল অবস্থায় অবস্থান করিয়া থাকে। তন্দ্রাতে যেমন আমরা কোনরূপ চিন্তা করি না এবং ভালমন্দ বুঝিতে পারিনা, এ অবস্থাটীও সেইরূপ। তদবস্থায় পশুপক্ষী বা মনুষ্যাদি কর্ত্তৃক সেই সকল শস্য ভক্ষিত হয়। মরণের পূর্ব্বে জীবের যে জাতীয় সংস্কার বিকাশোন্মুখ থাকে মরণের পরে ধান্যাদিতে আতিবাহিক ভাবাপন্ন থাকার কালে উক্তরূপ সংস্কার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সেই জাতীয় প্রাণী আসিয়া ঐ সকল ধান্যাদি ভক্ষণ করিয়া থাকে। যাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে মনুষ্যজাতীয় সংস্কার প্রজ্জলিত হয় ও কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা তাহার অন্তরায় না ঘটে, তাহা হইলে, তাহার আশ্রিত ধান্যাদি শস্য, পশ্বাদির উদরে না গিয়া তণ্ডুলাদিরূপে পরিণত হইয়া পরিশেষে অন্নরূপ ধারণ করতঃ তাহার সংস্কার বা কর্ম্মানুরূপ পুরুষের কবলগত হইয়া থাকে। এইভাবে প্রাণাশ্রিত জীব মনুষ্য দেহে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। তাহার পর সেই অন্ন সমুদায় যখন জীর্ণ হইয়া শরীরের নানা উপাদানের পুষ্টি করিতে থাকে, তখন সেই আতিবাহিক ভাবাপন্ন জীব, সেই সমস্তের মধ্য হইতে (৪র্থতঃ) শুক্ররূপে উৎপন্ন হইয়া উঠে। পরে যথা সময়ে স্ত্রীগর্ভে সিঞ্চিত হইয়া শোণিত সহযোগে ভ্রূণরূপে গর্ভবাস করে। এই

ভাবে প্রকৃষ্টদেহ লাভ করিলে পর, জীবের নূতন দেহের সহ সংযোগ ঘটে ও ভোগ আরম্ভ হয়, অন্তরিন্দ্রিয় পরিস্ফুট হইয়া স্মৃতিশক্তির বিকাশ পায়। তখন পূর্ব্বতন জন্ম সমূহের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইতে থাকে। গর্ভ্ত-বাসের ভাব আমাদের স্বপ্নাবস্থার অনুরূপ। (৫মতঃ) দশম মাসে সন্তানস্বরূপ প্রসূত হয়। প্রসূত হইলেই সেই স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া জাগ্র-জ্জগতে প্রবেশ করা হইল। সুতরাং জন্মগ্রহণ করার পরে সেই স্বপ্নবৎ ভাবটী স্মরণ করার সুবিধা থাকে না। মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিতে
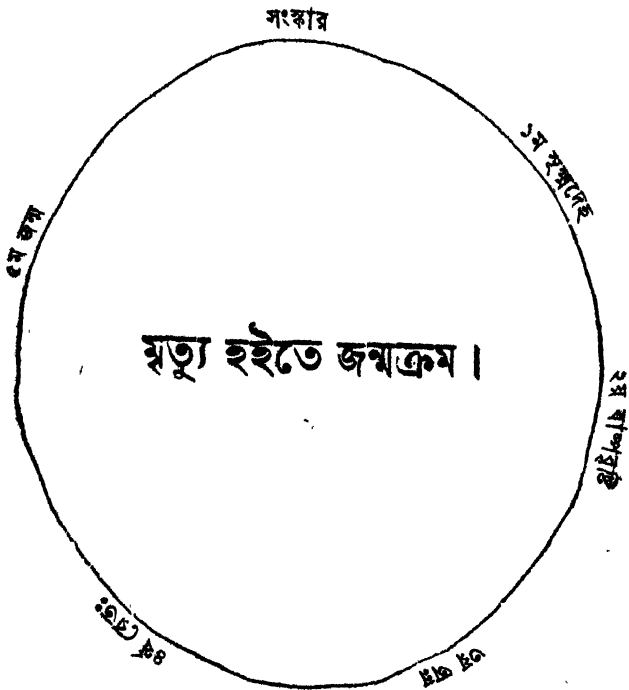
এতগুলি বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আসিতে হয় বলিয়া হিন্দুদিগের মধ্যে "মানবজনম দুর্লভ" এই গাথা কথা প্রচলিত আছে।

৬০ পৃষ্ঠার চিত্রে সংস্কারের পরেই জন্ম চিত্রিত হইয়াছে; এখানে মৃতাবস্থার কারণীভূত সংস্কারগুলি যে যে পরিবর্ত্তনের মধ্যদিয়া মানবজন্ম ধারণ করে তাহার বিশেষ চিত্র দেওয়া গেল। ৬০ পৃষ্ঠার চিত্রস্থ সংস্কার ও জন্ম শব্দের মধ্যস্থলে এই চিত্রের সমাবেশ বুঝিতে হইবে।

অন্যান্য জাতীয় মনুষ্যদের মধ্যে এই সকল তত্ত্ব প্রচারিত নাই। মৃত্যুর পরের অবস্থা সকলেরই অজ্ঞাত। অহিন্দুগণ এতাদৃশ অজ্ঞতা জনিত পুনর্জ্জন্ম নাই ও মরিয়া ভূত হইতে হয় এইরূপ সংস্কার জীবমানে অর্জ্জন করিয়া থাকে, সুতরাং মরণান্তে সেইসকল সংস্কার দ্বারা তাহাদের প্রেতত্বপ্রাপ্তি অবধারিত আছে। প্রলয়ের পর নূতন সৃষ্টি না হইলে আর তাহাদের পুনর্জ্জন্মের সম্ভাবনা নাই। এই নিমিত্ত হিন্দুভিন্ন অপরাপর জাতীয় মনুষ্যগণ জীবের পুনর্জ্জন্ম মানিতে পারে না।

অট্টালিকাজাত অশ্বত্থ বৃক্ষ বর্ষে বর্ষে কর্ত্তন করিলেও যেমন ভিতরে জড় থাকাতে পুনরুদ্গত হয়, আমাদের দেহরূপ অশ্বত্থবৃক্ষেরও মৃত্যু দ্বারা স্থূলশরীর ও সূক্ষ্ম শরীর লীন হইয়া যায়; অব্যক্ত কারণশরীর জড়ের ন্যায় বজায় থাকাতে, তাহা হইতে পুনর্জ্জন্ম সংঘটন হইয়া থাকে। এক্ষণকার কালে যেরূপ শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত হইয়াছে তাহা কেবল বাহ্যজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তদ্দ্বারা সূক্ষ্মশরীরের মধ্যে উৎকৃষ্ট সংস্কার উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা নাই। লোকে সচরাচর যাহা বলে ও যেরূপ চালে চলে, তাহা তাহাদের অন্তরের ভাব বিকাশ নহে। অন্তরে একরূপ থাকিয়া বাহিরে যে ব্যক্তি সভ্যভব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে অধুনা তাহারই অভ্যাস হইতেছে। এতদ্দ্বারা অন্তঃসারবিহীনতা ঘটিয়া জীবের প্রেতত্বভাব উন্মুক্ত করা হয়।

প্রাচীনকালে মনস্বি-মহাত্মগণের পন্থানুসরণ করিয়া সৎসংস্কার সংগ্রহ করা হইত, তদ্দারা জীবের স্বর্গগতির সম্ভাবনা ছিল।

এইরূপে প্রকৃতির বিভিন্ন সংস্কারের বিকাশ দ্বারা আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টি দেহের যাবতীয় কার্য্য সংঘটিত হইয়া থাকে। সেই সংস্কারময়ী প্রকৃতিকে আমাদের ন্যায় ব্যষ্টি পুরুষগণের সুতরাং সমষ্টি বিরাট্ পুরুষেরও স্বভাব বা শক্তি কিম্বা সামর্থ্য বলিয়া থাকে।

সাংখ্যমতে প্রকৃতিদ্বারা কার্য্য হয় বলিতে প্রকৃতিকে আত্ম-শক্তি বুঝিতে হয়। যাহা আমাদের ন্যায় ব্যষ্টি পুরুষের শক্তি, বা সংস্কার-বিশিষ্টপ্রকৃতি তাহাই সমষ্টিভাবে বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর নামক তিন মূর্ত্তিধারী মহাপুরুষের মহাশক্তি অর্থাৎ মহাশক্তির একাংশ। আমার শক্তি দ্বারা কার্য্য করিলে যেমন আমি করিয়াছি বলা হয়, সেইরূপ চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বময়ী প্রকৃতি (বা মহাশক্তি) দ্বারা যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহাও মহাপুরুষ বা ঈশ্বর করিতেছেন বলিয়া থাকে। শক্তি এবং প্রকৃতি একই কথা। যাহারা শক্তি বা প্রকৃতি দ্বারা জগদ্রচনা অবধি আরম্ভ করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম এমন কি তোমার আমার শৌচ প্রস্রাব পর্য্যন্ত যাবতীয় ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া বুঝেন, তাঁহারাই যথার্থ ঈশ্বর-ভক্ত; তাঁহারাই আস্তিক; তাঁহারাই সাংখ্যের তত্ত্বাতীত পুরুষ।

যাহারা আমার শক্তির (সামর্থ্যের) খবর জানে তাহারা আমার অস্তিত্ব মানেনা, একথা যেমন অসম্ভব, সাংখ্য-বিদ্‌গণ নাস্তিক একথা ততোঽধিক বিস্ময়জনক ও মিথ্যা।

সাংখ্যশাস্ত্র সেই মহাশক্তি বা প্রকৃতিকে ভাগে ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রদর্শন করে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

মহেশ্বর।

আমরা অনেক প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছি যে "কোন বস্তু থাকিলেই তাহার একটা কর্ত্তা থাকিবে।" এই সূত্র ধরিয়া ঈশ্বর মান্তকরা হিন্দুর কর্ম্ম নহে। ব্রাহ্মের ঈশ্বর, খ্রীষ্টানের গড্, এইরূপ ভাবে কল্পিত হইলেও, হিন্দুর ঈশ্বর তাহা নহে। যাহা কিছু আছে বলিয়া ধরা যায় তাহাই—ঈশ্বর। অন্যেরা বলে "যাহা কিছু আছে তাহার যে স্রষ্টা সে হইল—ঈশ্বর।" এখন কথা হইতেছে কিছু থাকিলেই যে তাহার স্রষ্টা থাকিবে এমন মনে করা উচিত হইতে পারে না। তাহা হইলে ঈশ্বরও ত একটা কিছু, তাহারও স্রষ্টা থাকা চাই, এইভাবে অনবস্থা দোষ ঘটে। ফলতঃ এই বড় মূর্খের কথা যে, যাহা আছে তাহাকে ঈশ্বর বলিব না, অথচ তাহার স্রষ্টা আছে কিনা জানিনা, তথাপি একটা স্রষ্টা কল্পনা করিয়া ঈশ্বর বলিয়া ভক্তি করিতে হইবে!

আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি যে মরণের পরে সংস্কার অবশিষ্ট থাকে ও তাহা হইতে পুনর্জ্জন্ম হয়। এই কথা যেমন একটী জীবের সম্বন্ধে খাটে তেমন অনন্ত জীবের সমষ্টি এই নিখিল জগতের প্রতিও প্রযুক্ত হয়, অর্থাৎ জগতের লয় হইলে সেই প্রলয়াবস্থাতে যাবতীয় প্রাণীপুঞ্জের সংস্কার কারণরূপে বিদ্যমান থাকে, এবং সৃষ্টির সময়ে সংস্কারগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া অভিব্যক্ত হয়।

এজন্য হিন্দুশাস্ত্রের মত এই যে,—এই জগৎ প্রপঞ্চ বাহিরের কোন ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয় নাই। ইহা পর্য্যায় ক্রমে এক বার ব্যক্ত হয়

তাহাকে সৃষ্টি কহে, পুনরায় অব্যক্ত হইয়া যায় তাহার নাম—প্রলয়। সুতরাং সর্ব্বসমষ্টি স্বরূপ ঈশ্বরের দুইটী মূর্ত্তি আছে যথা—সৃষ্টির সময়ে জগন্মূর্ত্তি, প্রলয়ে অব্যক্তমূর্ত্তি। এজন্য হিন্দুর কথা এই যে—ঈশ্বর অব্যক্ত মূর্ত্তি হইতে বহু হইয়া জন্মগ্রহণ করেন পুনরায় প্রলয়ের সময়ে অব্যক্ত মূর্ত্তিতে প্রবেশ করেন। অন্যেরা প্রলয়ের কথা কিছু বলিতে সক্ষম নহে, তাহারা এই জগৎকে ঈশ্বরের মূর্ত্তি বলিতে পারেনা, বলে—ঈশ্বর নামক বাহিরের কোন ব্যক্তি ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছে। হিন্দুরা এতাদৃশ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এখানে আমরা জগতের ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থা ধরিয়া ঈশ্বরের দুই মূর্ত্তি দেখাইলাম। ইহার মধ্যে ব্যক্ত অবস্থা আবার দুইভাগে বিভক্ত যথা—স্থূল ও সূক্ষ্ম। সুতরাং ঈশ্বরের তিনটী মূর্ত্তি ধরিতে হয় যথা—স্থূল সূক্ষ্ম ও অব্যক্ত। স্থূল মূর্ত্তির নাম বিরাট, সূক্ষ্মের নাম হিরণ্যগর্ভ ও অব্যক্ত মূর্ত্তিকে ঈশ্বর কহে। অথবা যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই নামও বলিয়া থাকে। এই স্থূল, সূক্ষ্ম ও অব্যক্ত (কারণ) তিন অবস্থা আমাদের মত ভিন্ন ভিন্ন জীবের মধ্যেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা স্থূলের নাম জাগ্রৎ, সূক্ষ্মের নাম স্বপ্ন, কারণ বা অব্যক্ত অবস্থার নাম সুষুপ্তি।

শাস্ত্রে কথিত আছে—

জাগ্রে ব্রহ্মা স্বপ্নে বিষ্ণুঃ সুষুপ্তৌচ মহেশ্বরঃ।

তাহাতেই আমরা বারংবার বলিয়া আসিতেছি যে—ঈশ্বর জগতের নির্ম্মাতা বা স্রষ্টা নহেন, জগৎই ঈশ্বরের রূপ। আমরা, জীবগণও ঈশ্বর হইতে পৃথক্ নহি—ঈশ্বরের এক একটী অংশ মাত্র। নব্যগণ কি হিন্দুদিগের এই ভাব স্বীকার করিতে পারেন? তাঁহারা জগৎকে যে উপাদানে গঠিত মনে করেন, ঈশ্বরকে তাহা অপেক্ষা পৃথক্ পদার্থময় ভাবিয়া থাকেন। হিন্দুর কথা মতে ব্যক্ত জগৎ, অব্যক্ত ঈশ্বর উপা-

দানেই রচিত সুতরাং জগৎকে ঈশ্বরের ব্যক্ত মূর্ত্তি বলা হয়। হিন্দু আরও জানেন, জীবগণ সুষুপ্তি ও মৃত্যুতে ঈশ্বরের ব্যক্ত রূপ হইতে অপসৃত হইয়া সংস্কার মাত্র আশ্রয় করিয়া, তাঁহার অব্যক্ত সত্তাতে প্রবেশ করিয়া থাকে। তথা হইতে পুনরাগত হইয়া জাগ্রৎ বা পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরের যেমন নাশ নাই, ঈশ্বরের অংশ বলিয়া জীবেরও ধ্বংস নাই। এজন্য আমাদের মত জীবই সাধনাদি বলে নিজের মধ্যে ঈশ্বরের সত্তা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয়।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ঈশ্বরের সেই মৃত্যুরূপ দর্শন করিয়া ভীত হইয়াছিলেন। হিমালয় পার্ব্বতীর মধ্যে মাহেশ্বর-রূপ দর্শনে বলিয়া ছিলেন—"ভীতোহস্মি সাম্প্রতং দৃষ্ট্বা রূপমন্যৎ প্রদর্শয়॥"

তোমার সংহাররূপ দর্শনে বড় ভীত হইয়াছি অতএব অন্যরূপ প্রদর্শন কর।

ফলতঃ আমরা প্রত্যেকে সেই ঈশ্বরের অংশ বিধায় আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ঈশ্বরের স্থূল, সূক্ষ্ম ও অব্যক্তকারণরূপ বিদ্যমান আছে। আমরা জাগরণে ঈশ্বরের স্থূল জগদ্রূপকে ভোগ করি, স্বপ্নে সূক্ষ্ম মূর্ত্তির উপভোগ হয়, আর সুষুপ্তির বেলাতে শ্রান্ত হইয়া এই উভয়-বিধ ভোগের অতীত ঈশ্বরের অব্যক্ত সত্তাতে প্রবেশ করিয়া থাকি। সেই অব্যক্ত, অজ্ঞেয়, অন্ধকারস্বরূপ ঐশভাব হইতে আমাদের বুদ্ধি স্রোতের ন্যায় উদ্ভূত হইয়া স্বপ্ন ও জাগ্রজ্জগতে প্রবিষ্ট হয়।

সুষুপ্তি ও মৃত্যুতে জীবের বুদ্ধি ঈশ্বরের অব্যক্ত সত্তাতে প্রবেশ করিয়া, আপন প্রবাহ ভাব ত্যাগ করিয়া কারণ (সংস্কার) রূপে পরিণত হয়। তখন জীবের সম্বন্ধে দ্বিতীয় কিছু বিদ্যমান না থাকাতে কিছুই অনুভব করেনা। সেই অব্যক্ত ঈশ্বরাবস্থাই আমাদের সকলের এবং এই জগতের মূল (জড়) স্বরূপ। আমরা জাগ্রৎ ও স্বপ্নরাজ্যের সমস্ত আশা,

ভরসা ও কামনা ত্যাগ করিলেই সেই মৃত্যুস্বরূপ অথচ মৃত্যুহীন মহেশ্বরে মিশিয়া থাকিতে পারি।

এইভাবে প্রস্তুত হইয়া গাঢ় ধ্যানাবিষ্ট হইলে জাগ্রৎ ও স্বপ্নজগৎ অতিক্রম পূর্ব্বক সুষুপ্তি স্বরূপ ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে পারা যায়। সংসারের কোন্ জীব সমস্ত আশা ছাড়িয়া জগতের বা ঈশ্বরের সেই অব্যক্ত সত্তার দিকে অগ্রসর হইতে পারে? এজন্য সচরাচর মনুষ্যেরা ঈশ্বরের স্থূল ও সূক্ষ্ম মূর্ত্তির দিকেই আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ফলকথা, সেই অব্যক্ত মৃত্যুর অবস্থাতে গিয়াও আমরা নষ্ট হইব না, এই ভাব অবলম্বন করিতে হইলে তাহার যথার্থ স্বরূপ বিদিত হওয়া আবশ্যক। নতুবা সেই সর্ব্বসংহারক ঈশ্বরাবস্থাকে আলিঙ্গন করিতে কাহার প্রবৃত্তি হইতে পারে? যেমন সেই দিকে জীবের স্বতঃ প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব, তেমন সুষুপ্তি লাভ করাও আমাদের স্বেচ্ছাধীন নহে। যত্ন করিয়া সমাধির অনুষ্ঠান করা যায় কিন্তু সুষুপ্তির সাধন চেষ্টার বহির্ভূত। সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা পরিত্যাগ না করিলে সুষুপ্তি লাভ করা যায় না।

আমরা স্বপ্ন ও জাগরণে সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি। এই উভয় অবস্থাতেই ভোগ্য, ভোক্তা ও ভোগ এই ত্রিবিধ ভাব বিদ্যমান থাকে কিন্তু সুষুপ্তিতে দ্বিতীয় কিছু থাকেনা। তখন ভোগ্য বস্তুর সত্তা না থাকাতে কিছুই ভোগ হয় না। কেবল একমাত্র ভোক্তারূপে আমি অবস্থান করি; সুতরাং তদবস্থাতে আমি আছি কি না এই জ্ঞানও হয় না। "আমি আছি" ইত্যাকার জ্ঞান হওয়াও দ্বৈত-সাপেক্ষ। কেন বলি?—"আমি আছি" এই ভাবটী আমি নই। "আমি আছি" এই ভাব যিনি বোধ করিলেন তিনিই—আমি পদার্থ। ফলতঃ সুষুপ্তির পূর্ব্বে বা পরে যখন স্বপ্ন জগতের সহ সংযোগ থাকে তখনই দ্বৈত আশ্রয়ে অহঙ্কার তত্ত্বদ্বারা "আমি আছি" এই জ্ঞান হইতে পারে।

সুষুপ্তি অবস্থা, কারণশরীর, প্রলয়, অজ্ঞান, (অথবা) পূর্ণজ্ঞান, আনন্দময়কোষ, ঈশ্বর, মহেশ্বর, অব্যক্তপ্রকৃতি, প্রধান ও পুরুষ এই সকল কথাতে পূর্ব্বোক্ত দ্বৈতহীন অবস্থাকে বুঝিতে হয় এই গুলি একার্থ বোধক শব্দ। আমরা প্রত্যহ সুষুপ্তিকালে যেমন ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হই, তেমন প্রতিজন্মের মৃত্যুতেও রুগ্ন, ভগ্ন, অকর্ম্মণ্য স্থূলশরীর ছাড়িয়া ঐ অবস্থাতে গিয়া বিশ্রাম করি।

অষ্টাঙ্গ ও ষড়ঙ্গ যোগ সাধন করিতে গেলে যে ভাবে ধারণা, ধ্যান, সমাধির অভ্যাস করার বিধান আছে, তদনুসারে এই সুষুপ্তি স্বরূপ ঈশ্বরকে চিত্তক্ষেত্রে ধারণা করা যাইতে পারে না, সুতরাং তৎপ্রতি ধ্যান বা সমাধিও হওয়া অসম্ভব—চিত্ত ঈশ্বরকে ধারণা করিবে কেমনে? উহা ত জাগ্রৎ বা স্বপ্ন রাজ্যের কোন বস্তু নহে;—ঈশ্বরাবস্থাতে চিত্ত প্রবেশ করিলেই চিত্তের লয় ঘটিয়া থাকে। চিত্ত নিজে যেথানে লয় প্রাপ্ত হয় তাহাকে ধারণা করা চিত্তের সাধ্যায়ত্ত নয়।

অতএব ঈশ্বর সম্বন্ধে যে ধ্যান হইতেই পারেনা এমনও বলা যায় না। যোগশাস্ত্রের প্রক্রিয়া ভিন্ন ব্রাহ্মণদিগের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে যে সকল বেদমন্ত্রের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় তদনুশীলন করিতে গেলে, ঈশ্বরের এই সর্ব্ব সংহার মূর্ত্তি অন্যভাবে চিন্তা করা হইয়া থাকে।

বেদাদিশাস্ত্রে প্রকৃতিকে পুরুষের (ব্রহ্মের) শক্তি বা ভর্গ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। তদনুসারে সৃষ্টিশক্তি দ্বারা উপলক্ষিত ব্রহ্মকে ব্রহ্মা বলে। ব্রহ্ম, প্রকৃতিরে ভোগ করার জন্য সৃষ্টি অবস্থা রক্ষা করিয়া থাকেন অতএব এই পালনী শক্তিসম্পন্ন ভোক্তা ব্রহ্মকে (সকলে প্রবিষ্ট থাকা হেতু) বিষ্ণু নাম দেওয়া হয়। আর ব্রহ্ম যখন জগৎকে ভোগ করিতে পরাঙ্মুখ হন (নৃত্যগীতের মন্দির হইতে রাজা উঠিয়া গেলে নর্ত্তকারা যেমন নৃত্য গীত সমাপ্ত করতঃ রাজার অনুগমন করে

তেমন) প্রকৃতি আপনার মহত্তত্ত্বাবধি ২৩টী মূর্ত্তি সঙ্কোচিত করিয়া পুরু-ষের অব্যক্ত সত্তাতে বিলীন হয়; ব্রহ্মের ভোগপরাঙ্মুখ সেই সংহারমূর্ত্তিকে রুদ্র নাম দেওয়া হয়। রুদ্র, জাগ্রত ও স্বপ্নজগৎ সংহার পূর্ব্বক দ্বৈত ভোগবিহীন হইয়া প্রলয়ে মহেশ্বররূপ ধারণ করেন। ইহাই জগতের সুষুপ্ত্যাবস্থা। জগতের ও নিজ দেহের বিনাশ চিন্তা করিতে থাকি-লেই তটস্থভাবে এই পরমেশ্বরচিন্তা হইয়া থাকে।

জীবগণ, জাগরণ ও স্বপ্নব্যাপারে শ্রান্ত হইয়া সুষুপ্তিকালে যে (মহান্ ঈশ্বরে) মহেশ্বরে প্রবেশ করিয়া বিশ্রামলাভ করে, শরীর জরা, ব্যাধি বা আঘাত দ্বারা জীর্ণ শীর্ণ বা ছিন্ন ভিন্ন হইলেও, মৃত্যুসময়ে সেই মহেশ্বরে পঁহুছিয়াই ঐ সকল যন্ত্রণার হাত হইতে উদ্ধার পায়। সেই ভীষণ হইতে ভীষণ মহেশ্বর যে জীবের এত মঙ্গলপ্রদ স্থান, তাহা স্থূল-বুদ্ধি মনুষ্য কিরূপে বুঝিবে? তাহারা মরণের পরে জীবের পুনরাগমন না দেখিয়া মৃত্যুকেই শেষ মনে করিয়া থাকে। ৮১ ও ৮২ পৃষ্ঠায় কথিতভাব বিদিত থাকিলে মহেশ্বরকে অশিব বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। শাস্ত্র কর্ত্তৃগণ মহেশের এই মঙ্গলময় ভাব বুঝিয়াই তাঁহাকে "শিব" বলিয়াছেন। নতুবা সৃষ্টি বা পালন কর্ত্তাকে শিব না বলিয়া সংহারের অধীশ্বরকে শিব বলেন কেন?

সুষুপ্তি ও মৃত্যুতে শিবের সহিত মিশিয়া পুনরায় জীবিত ভাব প্রাপ্ত হওয়াতে অনেকে বিতর্ক করেন যে সুষুপ্তি ও মৃত্যুর সময়ে যে সকল জীব শিবের সহিত মিশ্রিত হয় ঠিক তাহারাই পুনরাগত হইবে এমন বলা যায় না। তাহার কারণ এই—নদী হইতে এক ঘটী জল তুলিয়া লইয়া সেই জল নদীতেই ছাড়িয়া দিয়া যদি পুনরায় ঘটীকে জলপূর্ণ করা যায়, তবে পূর্ব্ববারের জলগুলিই যে শেষবারে ঘটীতে আসিবে এমন সম্ভাবনা করা যায় না। সেইরূপ সুষুপ্ত ও মৃত জীবেরই যে পুনরাগমন হইবে এমন

নিশ্চয়তা কি আছে? তদুত্তরে বক্তব্য যে—প্রত্যক্ষ দেখা যায়, জীব বাহ্যজগতে যতদূর কার্য্য করিয়া নিদ্রাগত হয়, সুষুপ্তি হইতে উত্থানের পরে ঠিক সেই পূর্ব্বকৃত কার্য্যই সমাধা করিতে প্রবৃত্ত হয়, নূতন জীব আসিলে এরূপ হইত না। তদ্ভিন্ন আমিই এ সকল কার্য্য করিয়া নিদ্রা গিয়া ছিলাম, এমন স্মরণ করিয়া বলিতেও পারিত না। মৃত্যু সম্বন্ধে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, যে যদিও বর্ত্তমান সময়ে জাতিস্মর লোক প্রায়ই দৃষ্ট গোচর হয় না কিন্তু পুরাকালে অনেকেই আপনার পূর্ব্বতন জন্মের কথা স্মরণ করিয়া বলিতে পারিতেন। দেবলোকের প্রায় সকল দেবতাই আপন আপন পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করিতে পারেন। মনুষ্য লোকেও বর্ত্তমান সময়ে তাদৃশ জাতিস্মর লোক বিদ্যমান নাই এমন বলা যাইতে পারে না। আমরা একজন জাতিস্মর ব্রহ্মচারীর সঙ্গলাভ করিয়াছিলাম। তিনি আপন পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত আমাদের নিকট বলিয়াছেন এবং আর দুই জন জাতিস্মর বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

এই সকল ঘটনাদ্বারা সুষুপ্তি ও মৃত্যু হইতে অভিনব জীবের আবির্ভাব না বুঝিয়া পূর্ব্বজীবেরই পুনরাগমন জানা যায়।

সেই অব্যক্ত মহেশ্বর যখন ব্যক্ত প্রাণকে আশ্রয় করেন, অর্থাৎ মহত্তত্ত্বের মধ্যে যখন চিৎপ্রতিবিম্ব প্রবেশ করেন তখনই জীবত্ব ঘটে, নতুবা তিনি সদাশিব।

সুষুপ্তি ও মৃত্যুতে আমি ছিলাম কি না, এই জ্ঞান না থাকিলেও সেই অবস্থাকে সংসারের অত্যন্তাভাব বলা যায় না। তাহা হইলে জীব, সুষুপ্তি ও মৃত্যু অবস্থাতে ঈশ্বরসাযুজ্য লাভ করিত, আর পুনর্জ্জাগরণ বা পুনর্জ্জন্ম লাভ করিত না। ফলতঃ সুষুপ্তি ও মৃত্যু অবস্থাতেও জগৎ কারণরূপে স্থিতি করে। প্রত্যহ দেখা যায় সুষুপ্তিতে যদিও

আপন অস্তিত্ব বোধ না থাকে তথাপি পূর্ব্ব শিক্ষাগত সংস্কার নষ্ট হয় না—সংস্কারের বিনাশ হইলে সকলকেই জাগ্রত হইয়া পুনরায় 'ক' 'খ' অবধি করিয়া শিক্ষা লাভ করিতে হইত। কিন্তু সেরূপ না হওয়াতে স্থির হয়—তদবস্থায় সংস্কারের সত্তা বজায় থাকে।

জীব সংস্কারকে আশ্রয় করিয়া থাকাতে মহেশ্বরের সহিত সম্যক্ মিশিতে পারে না, প্রতিপন্ন হইল। মৃত্যুদ্বারা জীবের নাশ হয় না, কেবল অবস্থান্তর (কারণদশা প্রাপ্তি) ঘটিয়া থাকে।

যোগদ্বারা মৃত্যুরঞ্জন।

আমরা যত্ন করিলে, যেমন নিদ্রা যাওয়ার সময়ে নিদ্রা না গিয়া জাগ্রত থাকিতে পারি, তেমন বিশেষ বিশেষ কায়দা করিয়া মৃত্যুর উচিত সময়েও না মরিয়া, জীবিত থাকা যায়। একথা নব্য সমাজ স্বীকার করেন কি না বলা যায় না। শাস্ত্রকারগণ সেই কায়দাকে 'যোগ' (হঠযোগের অন্তর্গত) বলিয়াছেন। বাহ্যজগতে প্রাণের যে মূর্ত্তি পাওয়া যায় তাহার নাম—বায়ু। যোগমতাবলম্বীরা বলেন যে—দেহ হইতে যে প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়া যাওয়াতে মনুষ্যের মৃত্যু হয়, তাহাকে যদি কৌশলক্রমে দেহ মধ্যেই চিরকাল আটকাইয়া রাখা যায়, তবে তদাশ্রিত জীবও দেহের মধ্যে থাকিতে বাধ্য হয়, সুতরাং এই উপায়ে মনুষ্য চিরজীবী হইতে পারে। এই জন্য প্রাণায়াম শিক্ষা করার জন্য যত্ন করা যায়।

আমাদের আশ্রিত কোন যুবক এই প্রলোভনে পড়িয়া প্রাণায়াম করিতে গিয়া শ্বাস ও উদরাময় পীড়া সৃষ্টি করিয়াছে। এক্ষণে রোগের

জ্বালায় সে এতই অধীর হইয়া পড়ে যে, কোন কোন সময়ে (প্রাণকে রুদ্ধ করার পরিবর্ত্তে) দেহনাশ পূর্ব্বক প্রাণকে চলিয়া যাইতে বলে। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া এখানে প্রাণ ও অপানের গতি বলা যাইতেছে।

আমাদের হৃদয়ে, প্রাণের স্থান ; গুহ্যমূলে অপান বায়ু স্থিতি করে। এই প্রাণ ও অপান উভয় বায়ুকেই রবারের বা জোঁকের ন্যায় স্থিতি-স্থাপক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাউক। মধ্যস্থলে নাভিদেশে যেন প্রাণ ও অপানের মধ্যে গ্রন্থি বন্ধন রহিয়াছে। দেহস্থিত প্রাণ, নাসাছিদ্র দ্বারা বহির্গত হইয়া বাহ্যবায়ুর সহিত মিশিয়া যাইতে চায়। প্রাণ বহির্গমন করিতে আরম্ভ করিলে, অপান একমাথা গুহ্যমূলে রাখিয়া বিস্তৃত হওতঃ, অপর মুখ বাড়াইয়া প্রাণের অনুগমন করে এবং টান পড়িলেই আপন স্থিতিস্থাপকতা গুণে প্রাণকে আকর্ষণ করিয়া নাভিদেশ পর্য্যন্ত প্রত্যানয়ন করে। প্রাণ পুনরায় তথা হইতে উর্দ্ধগামী হয়। তাহাতে দেহ হইতে নিশ্বাস বাহির হইতে থাকে, পুনর্ব্বার অপান কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া অধোগমন করাতে, বাহিরের বায়ু শ্বাসরূপে দেহের মধ্যে প্রবেশ করে। এই ভাবে প্রাণ ও অপানের উর্দ্ধাধোগমনদ্বারা চিরজীবন নিশ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে।

মৃত্যুকাল আগত হইলে, অপান আর প্রাণকে টানিয়া অধোদিকে রাখিতে পারে না বরং আপন স্থান গুহ্যদেশ পরিত্যাগ করিয়া প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে গমন করে। পরিশেষে নাভিমূল আশ্রয় করিয়া থাকার জন্য বিস্তর চেষ্টা করে। প্রাণ স্বাভাবিক অবস্থাতে যে পরিমাণে বহির্গমন করিতে পারিত, এখন অপানের স্থানচ্যুতি হওয়াতে তদপেক্ষা অধিক মাত্রাতে বহির্গমন করিতে থাকে, তাহাতেই মরণকালে দীর্ঘশ্বাস হইতে দেখা যায়। ইহাকে নাভিশ্বাস বলে। ক্রমে ক্রমে জীবকে

সঙ্গে করিয়া প্রাণবায়ু সম্যক্ প্রকারে বহির্গত হইয়া যায়। এজন্য যোগশাস্ত্রে কথিত আছে।

অপানঃ কর্ষতিপ্রাণং প্রাণোঽপানঞ্চ কর্ষতি।
রজ্জুবদ্ধো যথাশ্যেনো গতোঽপ্যাকৃষ্যতে পুনঃ।
তথাচৈতৌ বিষংবাদে সংবাদে সন্ত্যজেদিমম্॥

শ্যেন অর্থাৎ বাজপক্ষীকে রজ্জুদ্বারা বদ্ধ করিলে, পক্ষী উড়িয়া যাইতে চায় আর রজ্জু খুঁটার দিকে টানিয়া রাখে। বাজের গতিশক্তি ও রজ্জুর আকর্ষণ এই দুইটীর বিপরীত ক্রিয়া দ্বারা বাজ মৃত্তিকাতে বদ্ধ থাকে, আর রজ্জুটী পক্ষীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেই সে উড়িয়া যায়। সেইরূপ অপান বায়ু প্রাণবায়ুকে দেহের মধ্যে রাখিতে আকর্ষণ করে, প্রাণ অপানকে টানিয়া বাহির হইতে চায়। প্রাণ ও অপানের এই বিরুদ্ধ গতিদ্বারা দেহের মধ্যে স্থিতি হয়, যদি অপানও প্রাণের অনুগমন করে তাহা হইলেই দেহ হইতে প্রাণ চলিয়া যায়।

যাবৎ বায়ুঃ স্থিতো দেহে তাবজ্জীবিতমুচ্যতে।
মরণং তস্য নিষ্ক্রান্তি স্ততো বায়ুং নিবন্ধয়েৎ॥

বায়ু (প্রাণ), যতকাল দেহে অবস্থান করে ততকাল জীবিত থাকা যায়, সেই বায়ুর দেহপরিত্যাগকেই মরণ বলে, অতএব বায়ুকে নিরোধ করিতে হয়।

যথা সিংহো গজো ব্যাঘ্রো ভবেদ্বশ্যঃ শনৈঃ শনৈঃ।
তথৈব সেবিতোবায়ুরন্যথা হন্তি সাধকম্॥

সিংহ, হস্তী, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুকে যেমন ধীরে ধীরে পোষ মানাইতে হয়, সেইরূপ ধীরে ধীরে প্রাণায়াম সাধনা আবশ্যক নতুবা সদ্যোধৃত সিংহাদির ন্যায়, প্রাণও সাধকের বিনাশ সাধন করিয়া থাকে।

যোগমার্গিগণ দৈনিক ২১৬০০ শত শ্বাসের সংখ্যা কমাইয়া, আয়ুষ্কাল

বৃদ্ধি করিতে যত্নবান্। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে প্রাণায়ামদ্বারা শ্বাসের সংখ্যা হ্রাস করিবার জন্য কুম্ভক অভ্যাস করেন। তাহাতেই সমস্ত জীবনের জন্য শ্বাসসংখ্যা পূর্ণ হইতে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর কালের আবশ্যক হয়। বিধিনির্দ্দিষ্ট শ্বাসসংখ্যা পূর্ণ না হইলে মৃত্যুর অধিকার হয় না; সুতরাং যোগপথাবলম্বীরা কুম্ভক করিয়া দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারেন।

এখানে যোগ কথার বঙ্গানুবাদে 'কায়দা' শব্দ বুঝিতে হয়। ভল্লুকের নাক বিদ্ধ করিয়া যেমন এক এক দিকে টান দিয়া ভল্লুকের বিবিধ নৃত্য প্রদর্শন করা যায়। ভল্লুককে কতক পোষমানান হয়, কতক কায়-দাতে বদ্ধ রাখা যায়, সেইরূপ কায়দা করিয়া যোগীরা প্রাণ যাইবার মিয়াদ বৃদ্ধি করিয়া থাকেন।

সাংখ্যজ্ঞানিগণ এতাদৃশ কায়দা কানুনের পক্ষপাতী নহেন; তাঁহারা সমস্ত ব্যাপারটা আদ্যন্ত বুঝিতে চাহেন। তাঁহারা বলেন—যোগশাস্ত্রীয় কায়দা অবলম্বন করিয়া কালবঞ্চন পূর্ব্বক আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করিলাম তাহাতে কি হইল? মৃত্যুর হাত ত এড়াইতে পারা গেল না। মৃত্যুরও শেষ কি? একথা জানিতে হইবে।

সাংখ্যবিদ্যা দ্বারা সকল জীবেরই মরণান্তে কারণশরীর স্বরূপ সেই অব্যক্ত মহেশ্বরে প্রবেশ জানা যাইতেছে। ইহাতেও শেষ হইতেছে না। নাস্তিক দার্শনিকগণও এতদূর অগ্রসর হইতে পারেন। নাস্তিকের মতে মৃত্যুতেই সমস্ত চুকিয়া যায় অর্থাৎ মুক্তি। অতএব বলেন—"জীব-মানে ঋণ করিয়া ঘৃত পান করিয়া সুখ করিতে চেষ্টা কর!" ম্লেচ্ছ দার্শ-নিকগণ নাস্তিকদিগের ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দূরদর্শী নহেন। তাঁহাদের মনের উপরে আর গতি নাই। তাঁহাদের মতে চিন্তাবিহীন নিদ্রা (সুষুপ্তি) জীবের কখনই ঘটিতে পারেনা; একথা দ্বিতীয় অধ্যায়ে

[৪৯ পৃষ্ঠাতে] উল্লিখিত হইয়াছে। নাস্তিকেরা পরকাল মানেনা ; ম্লেচ্ছ-গণ পরকাল বুঝে না। ম্লেচ্ছগণও ঐহিক স্বার্থকেই পরমার্থ ধরিয়া লয়। তাহাদের মধ্যে যে পরকালের কথা প্রচলিত আছে, তাহা কেবল সরল মনুষ্য দিগকে বাধ্য রাখিবার নিমিত্ত। আস্তিক দর্শনিকেরা শব্দ-প্রমাণ অর্থাৎ বেদকে অকাট্য বলিয়া জানেন। জীবের পুনর্জ্জন্ম কথা বেদে স্বীকৃত আছে। আস্তিক দার্শনিকেরা যুক্তিপ্রমাণদ্বারা তাহাই স্থাপন করেন। সুতরাং তাঁহারা জানেন যে জীব, মৃত্যুর পরে শিবের সহিত মিশিয়া থাকিলেও তাহা পাকা মেশা নহে। জলসকল তাপ-দ্বারা বাষ্প হওতঃ অদৃশ্য হইয়া যায়, তখনকার জন্য জলগুলি আকাশের সহিত মিশিয়া আছে বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাই চূড়ান্ত মেশা নহে, শৈত্যসমাগমে সেই বাষ্প, শিশির ও বৃষ্টিরূপে পুনরায় জলাকারে ভূপৃষ্ঠে আগত হয়। সেইরূপ জীব যতদিন আপনাকে শিব বলিয়া বুঝিতে না পারে, সুতরাং সংস্কারসম্ভূত জড় জগতের সহ জড়িত থাকে, ততকাল সুষুপ্তি বা মৃত্যুতে শিবের মধ্যে প্রবেশ করিলেও, তাহা জলীয় বাষ্পরাশি আকাশের সহিত মেশার ন্যায় অচিরস্থায়ী। তাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে "মিশিয়াছে" বলা যায় না। ১০০ পৃষ্ঠাতে এই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

মৃত্যুর পরেই জীব, পুনরায় প্রাণকে আশ্রয় করিয়া যে বিদ্যা ওকর্ম্ম-সহ সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে তাহার নাম পুর্য্যষ্টক। তাহাই আতিবাহিকদেহে গমন করিয়া থাকে। ৮৭।৮৮ পৃষ্ঠাতে আতিবাহিক দেহের কথা বলা গিয়াছে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে কিছু বলিতে হইল, এই অংশটী তৎসহ একত্রে পঠিতব্য। মরণের পরে যমালয়ে যাওয়ার কথা সকলেই শুনেন; ইহলোক হইতে উপযুক্ত লোকে লইয়া যাওয়া যমের কার্য্য। আতি-বাহিক দেহ দ্বারা তাহা সাধিত হয়। সচরাচর নরকগামী পাপীদিগকেই

যমের অধীন বলিয়া থাকে। শাস্ত্রে কথিত আছে—এক যমই পাপীদিগের জন্য যমমূর্ত্তি ও পুণ্যবানের জন্য ধর্ম্মমূর্ত্তি পরিগ্রহ করতঃ তাহাদিগকে কর্ম্মানুরূপ নরকে বা স্বর্গলোকে পঁহুছাইয়া দিয়া থাকেন। স্বর্গে গিয়া দেবদেহ ধারণ করাকেও জন্ম বলে, নরকের যাতনাদেহ প্রাপ্তিকেও নরক-জন্ম বলা যায়। সাধারণতঃ মরণান্তে জীবের ত্রিবিধ গতি ঘটে যথা—

(১ম) ঊর্দ্ধগতি—দেবশরীর ধারণার্থ স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ।

(২য়) মধ্যগতি—মৃত্যুর অধীন হইয়া মনুষ্য-পশু-পক্ষি বৃক্ষাদি-রূপে এই লোকে পুনরাগমন।

(৩য়) অধোগতি—যাতনা ভোগের জন্য নারকীয় শরীর গ্রহণ পূর্ব্বক নরক-ভোগ।

মোটের উপর এই তিন প্রকার গতি আছে, আবার উহার মধ্যে নানাবিধ শ্রেণী বিভাগ রহিয়াছে; মর্ত্ত্যলোকে যেমন পশুপক্ষ্যাদি বিবিধ জাতি দৃষ্ট হয়, দেবলোকেও তেমন পশুপক্ষ্যাদির অস্তিত্ব জানা যায়। তাহা না হইলে কল্পবৃক্ষাদি—বৃক্ষ, গরুড়, সম্পাতি, জটায়ু প্রভৃতি—পক্ষী, সুরভি, সুশীলা প্রভৃতি—গাভী, ঐরাবতাদি—হস্তী, কোথা হইতে আসিল?

উক্ত ত্রিবিধ গতি ভিন্ন মরণান্তে গতিহীন অবস্থাও ঘটিয়া থাকে, তাহাকে প্রেতত্ব বলে। গরুড়পুরাণে প্রেতখণ্ডে কথিত আছে—যাহারা পরকাল জানে না বা মানে না এবং যাহারা বেদ মানিতে পারে না, ও যে সকল লোক স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বেড়ায়, যাহারা প্রেতত্বের অবস্থা জ্ঞাত নহে, * এতাদৃশ ও অন্যান্য দুর্ম্মতি-পরায়ণেরা মরণান্তে

---

* পাঠকদিগের ভাবী প্রেতত্ব-ভোগ রহিত করার জন্য এই পুস্তকের নানাস্থানে আমরা প্রেতত্ব-প্রসঙ্গ করিতেছি, সে গুলি মিলাইয়া পাঠ করিলে ভাল হয়।

প্রেতশরীর ধারণ করিতে বাধ্য হয়। তদবস্থায় ইচ্ছামত পানভোজ-নাদি করিবার সামর্থ্য থাকে না। তাদৃশ প্রেতদেহ পিতামাতা হইতে জন্মে না। যে শরীরে মরণ ঘটে মৃত্যুকালে সেই শরীরের যাদৃশ বয়স ও অবস্থা থাকে, তদনুরূপ ছায়াদ্বারা প্রেতদেহ রচিত হয়। তাহা বাতাসের সহযোগে চরিয়া বেড়াইতে থাকে। প্রেতের দুর্দ্দশার সীমা নাই। প্রেতত্ব রহিত না হইলে জীবের পূর্ব্বোক্ত বিবিধ গতির কোন গতিই হইতে পারে না। এজন্য হিন্দুগণ মরণান্তে প্রেতত্ব না ঘটিবার জন্য যত্নবান্ হন এবং আত্মীয়েরা মৃতব্যক্তির প্রেতত্ব দূর করিয়া গতি করাইতে চেষ্টা করিয়া থাকে।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, মরণের পরে যাহাদের নরকগতি হইবে, তাহারা প্রেতাবস্থায় থাকিয়া নরক যন্ত্রণা এড়াইতে পারে। তাহা-দের পক্ষে প্রেত থাকাই ভাল; কিন্তু প্রণিধান করিলে একথার দোষ বুঝা যাইতে পারে। প্রলয়ে যখন ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ ঘটিবে তখন প্রেত দিগেরও দেহ নাশ হইয়া যাইবে। প্রলয়ের পরে পুনরায় সৃষ্টি আরম্ভ হইলে, পূর্ব্ব সৃষ্টিতে যাহারা নরক গমনোপযোগী সংস্কার অর্জ্জন পূর্ব্বক মৃত হইয়াছে, (তাহাদের নরকভোগ প্রেতত্ব দ্বারা স্থগিত থাকিলেও প্রেতদেহ প্রলয়ে বিনাশ হওয়াতে) এবার প্রথমে তাহারা নারকীয় দেহ ধারণ করিয়া নরকভোগ করিতে থাকিবে; সুতরাং প্রেতত্বে থাকিয়া নরকভোগ কাটাইতে পারে না।

অতএব যাহাতে মরণের পর প্রেতত্ব সংঘটিত না হয় সেজন্য হিন্দু মাত্রেরই যত্ন করা উচিত। হিন্দুর বংশে জন্মগ্রহণ করতঃ অন্তঃকরণটা যদি ম্লেচ্ছের অন্তরের অনুরূপ গঠিত হয়, তবে তাদৃশ হিন্দু সন্তানের ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় প্রেতত্ব না ঘটিবে কেন? ম্লেচ্ছগণ ও ম্লেচ্ছশিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দু সন্তানগণ, 'মরিয়া প্রেত হইব' এতাদৃশ সংস্কার ইহলোকে

অর্জ্জন করতঃ পরলোক গমন করিয়া থাকে সুতরাং তাহাদের প্রেতত্ব একরূপ অবধারিত আছে।

প্রাণায়ামাদির সাহায্যে মৃত্যুকালটী সরাইয়া দূরবর্ত্তী করা যাইতে পারে, কিন্তু নরক, প্রেতত্ব প্রভৃতি পারত্রিক দুর্দ্দশার সম্ভাবনা গুলি, যেমন তেমনই থাকিয়া যায়। একারণ জ্ঞানবানেরা সেজন্য আগ্রহ করেন না, তবে কিনা উচ্চাঙ্গের যোগানুষ্ঠানকে সকলেই শ্লাঘ্য বলিয়া থাকে। আমাদের কথা দ্বারা মুনি ঋষি সেবিত যোগের প্রতি কটাক্ষ করা হইল, কেহ এমন মনে করিবেন না।

জীব ও শিব অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা।

উপরে জীবের কথা বারংবার উল্লেখ করা গিয়াছে। জীবটা কি পদার্থ, জানিবার জন্য পাঠকের ঔৎসুক্য হইয়া থাকিবে। শিরোনামে 'জীব' কথাটী লিখিত দেখিয়া পাঠক এখানে তাহার লক্ষণাদি দ্বারা পরিচয় পাওয়ার আশা করিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই জীব যে জানিবার উপযুক্ত বস্তু নয়, একথাই এখানে প্রতিপন্ন করার জন্য আমরা বাধ্য হইয়াছি।

কোন একটা বস্তু দর্শন করিয়া বুঝিতে হইলে, তথায় তিনটী পদার্থের অবশ্যক হয়; যথা—(১ম) চক্ষুঃ (২য়) দৃশ্যবস্তু ও (৩য়) চক্ষুর সহিত সেই বস্তুটীর সংযোগ। এখানে যদি পাঠক এক বস্তু ও জীব দ্বিতীয় বস্তু হইত, তবে তৃতীয় বস্তু—সংযোগ অর্থাৎ জ্ঞানটীকে, আমরা জুটাইতে পারিতাম; কিন্তু ইহা স্বতন্ত্র ব্যাপার। যে জীবকে জানিতে হইবে, পাঠক স্বয়ংই সেই জীব। পাঠক পাঠককেই জানিবেন,

আমরা বাহিরের লোক, তাহার আবার কি সংযোগ করিয়া দিব? পাঠক যদি বলিতে পারিতেন আমি খোয়া গিয়াছি তোমরা আমাকে খুঁজিয়া আনিয়া দেও, তাহা হইলে বরং পাঠকের আমিটীকে, তালাস করিয়া আনিয়া, পাঠকের সহিত সংযোগ করিয়া দেওয়া সম্ভব হইত।

যে পাঠক একটী কৃত্রিম (অস্মিতা) ধরিয়া বসিয়াছেন, অথবা যিনি আমরি প্রতি খেয়াল না রাখিয়াই, আমার আমার করিয়া ঘুরিতে-ছেন, তাঁহার কাছে আমরা নাচার। এতদ্ভিন্ন যে সকল পাঠক আপ-নার আত্মাহারা ভাব বুঝিতে পারিয়া "আমি কে?" এই কথার খোঁজ লইতেছেন, তাঁহাদের আমির সহিত সংযোগ হওয়ার উপায় বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

তাঁহারা এই জগৎ সংসারের জীব। তাঁহাদের 'আমিটী' এই সং-সারের মধ্যেই কোনস্থলে পড়িয়া গিয়া থাকিবে। যদি তাঁহাদের একটা আমি থাকা সম্ভব হয়, তবে জগতের মধ্যে অনুসন্ধান করিলেই পাওয়া যাইতে পারে। সহজে পাওয়া না গেলে জগৎটাকে ছাঁকিয়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখা আবশুক। এজন্যই বেদবেদান্তে "নেতি নেতি" করিয়া অর্থাৎ এটা আমি নই ওটা আমি নই এই ভাবে আত্মানুসন্ধান করিতে দেখা যায়।

সকলেই 'আমি আছি' একথা বুঝে, কিন্তু কোন্‌টা যে আমি, একথা কেহই বুঝিতেছে না। তাহাতেই এটা নই ওটা নই এই ভাবে আমি বুঝিতে হয়। আবার এ কথাও সহজে বুঝা যায় যে—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি আমি নই—এগুলি আমার পরিজন; হ্যাট, কোট, ঘড়ী, চেইন প্রভৃতিও আমি নই—তাহা আমার বসন ভূষণ, এইরূপ ঘর বাড়ী, চাকরি, পসার, প্রতিপত্তি, প্রভৃতিও আমি নই,—আমার ভোগ্য পদার্থ মাত্র; যদি আমি কিছু হই, তবে এই দেহ অথবা দেহের মধ্যস্থিত

পদার্থ বিশেষ হইতে পারি। এজন্য দেহস্থিত পদার্থ গুলি লইয়াই "নেতি নেতি" করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। পাশ্চাত্য শারীর বিজ্ঞান, এই স্থূল দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাহা সূক্ষ্মশরীর পর্য্যন্ত পঁহুছে না, সুতরাং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দ্বারা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান চলেনা। সূক্ষ্মদেহে অনুসন্ধান করিতে হইলে শাস্ত্রীয় বিজ্ঞান ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

ইতি পূর্ব্বে এই সমস্তব্রহ্মাণ্ডকে ও ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড-স্বরূপ আমাদের সাড়ে তিন হাত শরীরকে চব্বিশ তত্ত্বে বিভক্ত করিয়া ব্যাখ্যা করা গিয়াছে। তথাপি আমি কে পাওয়া যায় নাই। তাহার মধ্যে একটী তত্ত্বকেও আমি বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। অহঙ্কার তত্ত্বদ্বারা যদিও দেহাদি সংঘাতের প্রতি আমিভাব স্থাপিত হয়, তথাপি তাহাকে আমি বলা যাইতে পারে না। অহঙ্কার শব্দের ব্যুৎপত্তি এই যে—অহং (আমি) করে যে এই অর্থে অহং শব্দ পূর্ব্বক কৃধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যের প্রত্যয় দ্বারা 'অহঙ্কার' শব্দ সাধিত হইয়াছে। অহঙ্কার তত্ত্ব নিজে আমি নহে; এক এক বস্তুর উপর আমি ভাবটী যোজনা করিরা দেওয়াই তাহার ধর্ম্ম। আমি, ধ্যান দৃষ্টিতে অহঙ্কারতত্ত্বকে বিদিত হইতে পারি। আমি যে বস্তুকে জানিতে সমর্থ হই, সে বস্তুটী আমি হইতে পারি না। আমার চক্ষু যে সকল বস্তু দর্শন করিতে সমর্থ হয়, সেই দৃষ্ট বস্তুর একটীও আমার চক্ষু নহে, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। এইরূপ আমি যে সকল বিষয় জানিতে পারি তাহার একটীও আমি নহি। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন সাংখ্য-জ্ঞানিগণ, বর্ণিত চব্বিশটী তত্ত্ব বিদিত হইয়াছেন; তাদৃশ গভীর ভাবে চিন্তা করিতে পারিলে আমরাও তাহা অনুভব করিতে পারি। এক মনুষ্য যাহা করিয়াছেন, অন্যেরাও তাহা করিতে পারেন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সুতরাং তত্ত্ব গুলিকে জীবের

জানিবার উপযোগী পৃথক্ পদার্থ বলিয়া বুঝিতে হয়। এজন্যই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—যে আমি কে ? এই কথা কে জানিবে ?

মোটের উপর চব্বিশটী তত্ত্ব ও তত্ত্বগুলির মিশ্রণে সমুৎপন্ন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ভিন্ন আর জানিবার যোগ্য কিছুই বিদ্যমান নাই। আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্তই ইহার অন্তর্নিবিষ্ট। আমি যদি সেই তত্ত্বগুলিকে যথার্থ-ভাবে অবগত হইতে পারি তাহা হইলেই আমি সর্ব্বজ্ঞ হইলাম। অন্য সমুদায়ই, এই সকল তত্ত্ব হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। একটা সূতাকে জানিলে যেমন সমস্ত সূতাই ঐরূপ এবং সূত্রনির্ম্মিত বস্ত্রের বিষয়ও জানা হয়, সেইভাবে ২৪টী তত্ত্ব জানিলেই চব্বিশ তত্ত্ব দ্বারা রচিত এই সমস্ত জগৎকে জানা যায়। তাহাতেই সর্ব্বজ্ঞ হইল বলা যায়।

যখন চব্বিশ তত্ত্ব ভিন্ন জানিবার উপযুক্ত পদার্থ আর দ্বিতীয় কিছুই নাই অথচ আমি তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা চব্বিশ তত্ত্বকে বিদিত হইয়াছি, তখন আমি অবশ্য চব্বিশ তত্ত্ব হইতে পৃথক্ পদার্থ, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায়। এইভাবে ব্যতিরেকী যুক্তি অবলম্বন করিয়া "আমি জ্ঞাতব্য পদার্থ হইতে ভিন্ন বস্তু বলিয়া" আত্মার অস্তিত্ব জানা যাইতে পারে।

অতএব বলা যাইতেছে জীবকে জানা যায় না বলিয়া কেহ হতাশ হইবেন না। আপনাকে জানিতে হইলে অগ্রে জগতের সমস্ত বস্তুকে নিঃশেষ করিয়া জানিয়া লও। তাহার পরে বুঝিবে—সেই জ্ঞাতাই তুমি। তুমি যখন সমস্ত পদার্থ জানিতে পারিলে, তখন অবশ্য সেই সমস্ত হইতে পৃথক্ সত্তারূপে তুমি বিদ্যমান আছ।

ইদানীন্তন শিক্ষিত লোকেরা জগতের সমস্ত পদার্থ তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে রাজি নহেন। তাঁহারা যে পর্য্যন্ত জানিয়াছেন তাহার উপরে কেবল জীবাত্মা ও পরমাত্মাটা জানিতে চান। তাঁহাদের সম্বন্ধে বক্তব্য যে—তাঁহারা স্বীকার করিতে পারেন যে মোটের উপর জড় (matter)

ও চৈতন্য (Soul i. e. nous) এই দুই জিনিষ বিদ্যমান আছে। এই দুইএর সহযোগেই পরিদৃশ্যমান জগৎ রচিত হইয়াছে। জগৎকে বিশ্লেষণ (Analyse) করিলে মোটের উপর জড় ও চৈতন্য এই দুই প্রকার জিনিষ দাঁড়াইবে। তন্মধ্যে যাহার অস্তিত্ব দ্বারা আমরা কোন ভাব বা কোন বাহ্যবস্তু অনুভব করিতে পারি তাহাকে চৈতন্য বলে, তদ্ভিন্ন অবশিষ্ট যাহা যাহা অনুভব করা যায় সেগুলির সাধারণ নাম জড়।

অতএব চৈতন্যকে জ্ঞাতা জড়কে জ্ঞেয় বলা যায়, চৈতন্যকে ভোক্তা ও জড়কে ভোগ্য বলিতে পারি। গীতাতে চৈতন্যকে ক্ষেত্রজ্ঞ ও জড়কে ক্ষেত্র বলে। এক্ষণ জিজ্ঞাসা করি, পাঠক! তুমি এই দুইয়ের মধ্যে কোন্ জাতীয় বস্তু হও অর্থাৎ চৈতন্য কি জড়? অবশ্য উত্তর পাইব আমি জড় নই—চৈতন্য (Soul i. e. nous)। এখন প্রশ্ন হইতেছে সমস্ত জগতে কয়টী চৈতন্য আছে? উত্তর—যতটী জীব বিদ্যমান আছে তত সংখ্যক চৈতন্য রহিয়াছে। অতএব স্থির হইল চৈতন্যই জীবাত্মার স্বরূপ।

এখন পরমাত্মা কি? বুঝিতে হইবে। তুমি যেমন যতটী জীব ততটী চৈতন্য আছে মনে করিতেছ, জ্ঞানীরা কিন্তু তেমন মনে করেন না। তাঁহারা ভাবেন মোটের উপর একটী মাত্র চৈতন্য বিদ্যমান রহিয়াছে। লোকে যে চৈতন্যকে বহুরূপে বিভক্ত দেখে, এ দোষ চৈতন্যের নহে—যাহারা চৈতন্যকে অসংখ্য মনে করে তাহাদের অজ্ঞানতা হেতু এমন বোধ হইয়া থাকে। লাল, নীল, সবুজ ও শাদা এই চারি রঙ্গের চারিখানা কাচবিশিষ্ট লণ্ঠনের মধ্যে একটী প্রদীপ থাকিলে, চতুষ্পার্শের অজ্ঞ লোকেরা তাহা দেখিয়া লাল নীল সবুজ ও শাদা রঙ্গের চারিটী প্রদীপ আছে মনে করিতে পারে; এইরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির দেহ দ্বারা আচ্ছাদিত একমাত্র চৈতন্যকে অজ্ঞেরা বহুজীবাত্মা

বলিয়া ধরিয়া লয়। চক্ষুতে রোগ হইলে যেমন একমাত্র চন্দ্রকে দুই বা বহু চন্দ্র বলিয়া দেখা যায়, সেইরূপ অজ্ঞানতা নিবন্ধন লোকে একই চৈতন্যকে বহুজীব বলিয়া দেখিতেছে।

জ্ঞানীরা যে ঐ সমস্ত-জীবাত্মা একত্র করিয়া এক চৈতন্য বলিয়া অবগত হন তাহাকে পরমাত্মা বলা যায়। অজ্ঞের নিকট যাহা অসংখ্য জীবাত্মা, জ্ঞানীর পক্ষে তাহাই পরমাত্মা। আর যাহারা উক্ত অজ্ঞ-দিগের মধ্যে অধম ও মূর্খ, তাহারা ভাব না বুঝিয়া, কেবল নাম শুনিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মা নামক দুইটী কিম্ভূত কিমাকার পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া হট্টগোল করিতেছে।

সাধারণ মনুষ্যগণ, যাহাকে জড়জগৎ মনে করে, জ্ঞানীরা তাহাকে পূর্ব্বসংস্কার রাশির ঘনীভাব বলিয়া ধরিয়া লন এবং সংস্কার-ময় জড়-জগৎ হইতে স্বকীয় চৈতন্যময়-পরমাত্ম-সত্তাকে পৃথক্ করিয়া ধ্যান করেন। এরূপ অভ্যস্ত হইলে একদিকে জড়-জগৎ অপর দিকে চৈতন্যময় পরমাত্মা অবশিষ্ট থাকে। সংস্কারময় জড়জগৎকে বাদ দিয়া যদি চৈতন্যময় পরমাত্মাকে পৃথক্ করা যায়, তবে সেই চৈতন্যময়ের কি দশা ঘটে ভাবিয়া দেখা যাউক। এতকাল যে চৈতন্য এই জড় জগতের জ্ঞাতা, ভোক্তা বা ক্ষেত্রজ্ঞ ছিলেন, এখন তাঁহার জড় জগৎ অর্থাৎ জ্ঞেয়, ভোগ্য বা ক্ষেত্রের অভাব হেতু, তিনি কিছুই জানেন না কিছুই ভোগ করেন না, কেবল একাকী বিশ্রাম করিতেছেন। এতকাল তিনি দ্বৈত পদার্থ উপলব্ধি করিতে করিতে শ্রান্ত সুতরাং অশান্ত ছিলেন, এখন শান্ত হইলেন। এতকাল জড়জগতের সহিত একবার সংযুক্ত পুনরায় বিযুক্ত হইয়া জন্মমৃত্যু ভোগ করিতেন সুতরাং অশিব ছিলেন এখন শিব হইলেন। ইনি সংস্কার সংযোগে সমস্ত জগৎরূপে ব্যক্ত ছিলেন তখন ইঁহার নাম সর্ব্ব, এখন সমস্ত জগতের অভাব হেতু

প্রলয়রূপে বিরাজ করিতেছেন, চতুর্থ অধ্যায়ের আরম্ভে এই প্রলয়কে ঈশ্বর বা মহেশ্বর বলিয়া উল্লেখ করা গিয়াছে, অতএব ইনি সর্ব্বেশ্বর।

এইরূপে ঈশ্বরের অংশ-স্বরূপ জীব, ঈশ্বরে পরিণত হইয়া থাকে, এজন্যই বলে জ্ঞানদ্বারা মুক্তি ঘটে।

সমস্ত জড়জগৎকে তন্ন তন্ন করিয়া না জানিলে এতাদৃশ জ্ঞান হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

উক্তরূপ বিচার অবলম্বন করিয়া জ্ঞানীরা আপনাকে জীবাত্মা না ভাবিয়া পরমাত্মা বলিয়া বুঝেন। তাঁহাদের এতাদৃশ আত্ম-জ্ঞানের উদয় হইলে তাঁহারা আর কর্ত্তব্যকর্ম্মের অধীন থাকেন না। কর্ম্ম ও কর্ম্মজনিত সংস্কার তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না, অজ্ঞদের ন্যায় তাঁহাদের নূতন কর্ম্মজনিত-সংস্কার জমা হয় না, পূর্ব্ব সঞ্চিত সংস্কারগুলি বহু-জন্মদ্বারা নিঃশেষ হইয়া যায়, তখন তাঁহাদের মুক্তি হইয়া থাকে।

যদি বল, জগতের সমস্ত পদার্থ নিঃশেষরূপে না জানিয়া কিয়দংশ জানিলে কি আমার (জীবের) অস্তিত্ব বুঝা যায় না ?—হাঁ, তাহাতেও আত্মার অস্তিত্ব ধরা যাইতে পারে, কিন্তু সেই অস্তিত্ব অমিশ্র নহে, তত্ত্বের সহিত জড়িত অস্তিত্ব হইবে। আর সমস্ত বস্তুকে নিঃশেষ করিয়া অবগত হইলে আত্মার যে পৃথগস্তিত্ব বুঝা যায় তাহাই—অমিশ্র আমি বা খাস আমি।

আমরা যে কাষ্ঠাদিতে অগ্নির সত্তা দেখিতে পাই, তাহা অমিশ্র অগ্নি নহে; কাষ্ঠ বা বাষ্পমিশ্রিত অগ্নি। অমিশ্র অগ্নির সত্তা যে কিরূপ, তাহা সহজে বোধগম্য হয় না। সেইরূপ সাধারণ লোকে জীবের যে সত্তা উপলব্ধি করে তাহাও তত্ত্বের সহিত মিশ্রিত জীব; কিন্তু খাস জীব যে কি বস্তু, এ কথা কয়জন লোকে বুঝিতে পারে ?

জীবের নিভাঁজ খাঁটী সত্তা উপলব্ধি করিতে হইলে, একটী একটী

করিয়া চব্বিশটী তত্ত্ব তুলিয়া ফেলিলে, পরে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই—জীব, তাহাই—শিব।

জীব ও শিবের মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে হইলে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে—তত্ত্বের সহিত মিশ্রিত ভাবই জীবত্ব, এবং তত্ত্বের অতীত অমিশ্র ভাব—শিবত্ব। উহার উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—সূর্য্য যখন পুষ্করিণী প্রভৃতির জল মধ্যে প্রবেশ করে তখন তাহাকে "সূর্য্যক" (সূর্য্য-ছায়া বা প্রতিবিম্ব) বলে, আর স্বভাবাবস্থায় সূর্য্য বলা হয়। সেইরূপ চৈতন্যময় শিব তত্ত্বময় দেহের মধ্যে প্রতিবিম্বরূপে প্রবিষ্ট হইলে সেই প্রতিবিম্বাবস্থাকে জীব বলে। জীব তত্ত্বময় জগৎসংসারকে লয় করিলেই শিব হন।

এতৎপ্রতি প্রশ্ন,—প্রতিবিম্ব ত আসল জিনিষ নহে, সেটী কেবল ছায়ামাত্র, তবে জীবই কি প্রকারে শিব হইবে? জীব যে কিছুই নয়? ইতি শম্ভুচন্দ্র।

উত্তর—শম্ভুর এইরূপ প্রশ্ন যাহাতে অন্যান্য পাঠকের না হয়, তদুদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধমধ্যে কতকগুলি কথা নূতন যোজনা করা গিয়াছে। এখানে এইমাত্র বলিতেছি যে ছায়া বা প্রতিবিম্ব, মূল হইতে পৃথক্ বস্তু নহে। দ্রষ্টাব্যক্তি মূলের বিপরীত দিকে চাহিয়া, মূলের যে অনুকৃতি দর্শন করে তাহার নাম ছায়া। দ্রষ্টা যদি চক্ষু ঘুরাইয়া মূল পদার্থকেই দর্শন করে, তবে আর ছায়া দেখিবে না। তখনকার জন্য বলিতে পারি, যে তাহার দৃষ্ট ছায়া এখন মূল হইয়া দাঁড়াইল। যাহারা-চক্ষুরোগ বশতঃ একই চন্দ্রকে দুই আকারে দর্শন করে, তাহাদের রোগ দূর হইলে চন্দ্রকে এক মূর্ত্তিতে দেখিয়া যদি বলে, সেই অতিরিক্ত চন্দ্রটা কোথায় গেল? তাহার উত্তরে বলিতে পারি যে, তাহা এই চন্দ্রের সঙ্গে মিলিয়া এক হইয়াছে। এই ভাবে অজ্ঞের জীব, জ্ঞানাবস্থায় শিব হইয়া যায় বলে।

বিম্বকে না দেখিলে প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, তখন প্রতিবিম্বই পদার্থ হইল, আবার মূল বিম্ব দেখিবার সময়ে, প্রতিবিম্ব দেখা যায় না তখন উহা অপদার্থ। এইরূপ অজ্ঞসমাজে শিবের প্রতিবিম্ব জীবই পদার্থ ; শিব কিছুই নহে—কথার কথা মাত্র। তেমন জ্ঞানীর নিকট শিবই পদার্থ, জীব আর এখন স্বীকৃত হয় না, জীব—অপদার্থ। ফলতঃ একই বস্তুকে দুইভাবে দেখা হয় মাত্র। ইতি—ব্রহ্মানন্দ।

এজন্য শাস্ত্রে কথিত আছে যথা—

পাশবদ্ধোভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ॥

চব্বিশ তত্ত্বময় পাশ (রজ্জু) দ্বারা বদ্ধকে জীব এবং পাশ বন্ধন হইতে মুক্তকে সদাশিব বলিয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জীব সুষুপ্তি ও মৃত্যুদ্বারা শিবের মধ্যে প্রবেশ করে। সেই কালের জন্য সংসারের সুখ দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না ; কিন্তু তত্ত্বপাশে আকৃষ্ট হইয়া জীবকে পুনরায় সংসারে প্রবেশ করিতে হয়।

প্রশ্ন—শিব কেন তত্ত্বপাশে বদ্ধ হইতে যান ? কিরূপেই বা তাঁহার জীবত্ব ঘটে ? ইতি শম্ভুচন্দ্র।

উত্তর—বাস্তবিক শিব, তত্ত্বপাশে বদ্ধ হন না ; তিনি যেমন আছেন চিরকালই তেমন থাকেন। জ্ঞানীর ও অজ্ঞের দুই প্রকারের দর্শনকে একত্র করিয়া বলা যায় "শিব পাশবদ্ধ হইয়া জীব হইয়া থাকেন," অর্থাৎ জ্ঞানীদিগের একমাত্র পরমাত্মাকেই অজ্ঞেরা তত্ত্বসমূহের আবরণ দ্বারা আবৃত করিয়া জীবাত্মা বলিয়া বুঝে। ইতি ব্রহ্মানন্দ।

জীব যতদিন সংসারকে লয় করিতে না পারে, ততকাল তাহার অনবরত জন্ম মৃত্যু ঘটিতে থাকে। কখন স্বর্গে, কখনও মর্ত্ত্যে, কখন বা নরকে, জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিতে বাধ্য হয়।

এইরূপে সংসারচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে, কদাচিৎ তত্ত্বদর্শী সদ্‌গুরুর কৃপাতে স্বকীয় অমিশ্রসত্তা (শিবত্ব) বিদিত হইলে জ্ঞান জন্মিল বলা যায়। সেই জ্ঞান বা বিদ্যা দ্বারা [৬৪ ও ৬৫ পৃষ্ঠায়] কথিত অবিদ্যা বিনষ্ট হয়। তাহার পরে ধীরে ধীরে অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ প্রভৃতি সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যায়। তাদৃশ পুরুষের পক্ষে জগতের পৃথক্ সত্তা রহিত হইতে থাকে। এইরূপে জীব, চব্বিশ তত্ত্বরূপ রজ্জুর বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শিবরূপে বিরাজ করিতে থাকেন। তাঁহাকে আর জীবের ন্যায় জন্ম, মৃত্যু ও সুখ, দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। তিনি শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত ঝঞ্ঝাট হইতে এককালে মুক্তিলাভ করেন।

আমাদের মত মনুষ্যের পক্ষে সমস্ত জগৎকে লয় করিয়া, মুক্তিলাভ করা অসম্ভব বলিয়া বুঝা যায়। ফলতঃ আমরা বদ্ধজীব, আমাদের পক্ষে মুক্তি অসম্ভব বটে। তত্ত্বজ্ঞান না জন্মিলে মুক্তির সম্ভব-পরতা প্রতিপাদন করা যায় না,এজন্য শাস্ত্রাদিতে জ্ঞান অর্জ্জন করার জন্য বিশেষ নির্ব্বন্ধ দৃষ্ট হয়; মুক্তির বিচার সাধারণের আলোচ্য বিষয় নহে। যাঁহারা সমস্ত তত্ত্বগুলিকে সম্যক্ রূপে অবগত হন, অথচ জগৎসংসার লয় না করেন, তাঁহাদের অবস্থা কিরূপ হয়, অতঃপর এই কথার আলোচনা করা যাইতেছে। তাঁহারা ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়া সংস্কারের সত্তানুসারে, বিশেষ বিশেষ পদে অধিষ্ঠিত হন।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও অবতার।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি (১ম) যাহারা মূর্খ কিছুই বুঝে না, তাহারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা নামক দুইটা পদার্থ আছে বলিয়া বিবেচনা করে।

(২য়) কপিলাদির মতাবলম্বি-পণ্ডিতগণ, জ্ঞাতা চৈতন্যপদার্থের বিচারে স্থির করেন—যে প্রলয় কালে চৈতন্যময় পরমাত্মা, একথাকিলেও সৃষ্টির বেলায় বহু জীবাত্মা রূপে পরিণত হন। (৩য়) পরমার্থ-তত্ত্ববিদ্ জ্ঞানিগণ তেমন না ভাবিয়া সিদ্ধান্ত করেন, যে আত্মা এক বই নহে, তাহা নির্ব্বিকার; সৃষ্টিতে সেই চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মা, বহুজীবাত্মাতে পরিণত হন না, কিন্তু সংস্কারের আবরণের মধ্য দিয়া উপলব্ধি করাতে আত্ম-পদার্থ বহুজীবরূপে প্রতীয়মান হয়।

(১ম) এতাদৃশ পরম-তত্ত্ববিৎ জ্ঞানীদের মধ্যে যাঁহারা আপনার চৈতন্যময় অদ্বৈত সত্তা বুঝিতে পারিয়াও পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ দেহ, পরিজন ও সম্পদের মমতা ছাড়াইতে পারেন না, তাঁহারা ঐ সকল বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া আমাদের ন্যায় পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হন। (২য়) কিন্তু যাঁহারা প্রবল আত্মানুরাগ-নিবন্ধন সর্ব্বদা আত্মধ্যানে নিরত থাকেন সুতরাং ঐ সকল বিষয়ে বৈরাগ্য ঘটে, সংস্কারময় জড়-জগৎ ও নিজ দেহকে আপনাতে ভাসমান দেখেন; মরণান্তে তাঁহারা মহেশ্বরের সাযুজ্য প্রাপ্ত হন বটে, কিন্তু সংস্কারের বিলয় না করাতে সম্যক্ মিশিতে পারেন না। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহার রজোগুণের সংস্কার প্রবল, তিনি ব্রহ্মার পদে অধিরূঢ় হইয়া সৃষ্টি করিতে থাকেন, যাঁহার সাত্ত্বিক সংস্কার বলবান্, তিনি বিষ্ণু-সাযুজ্য পাইয়া রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হন, আর যাঁহার মধ্যে তামসিক সংস্কার উদ্দীপ্ত থাকে, তিনি রুদ্রত্ব লাভ করিয়া সংহার ব্যাপারে নিরত হইয়া থাকেন।

এই সকল পদই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ইঁহাদের মধ্যে সময়ে সময়ে আত্মধ্যানের লাঘবতা ঘটিয়া বহির্ম্মুখবৃত্তি উদিত হইলে, যে বিষয়ে চিত্ত ধাবিত হয়, তখন তদনুরূপ শরীর ধারণ পূর্ব্বক সেই কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। এইরূপে স্বপদ হইতে অবতরণ

কল্পান্তে তাঁহাদিগকে তৎকালের জন্য "অবতার" বলিয়া কীর্ত্তন করে। অবতারদিগের বহির্ম্মুখপ্রবৃত্তি নিবৃত্ত হইয়া, পূর্ব্বভাবের উন্মেষ হইলে তাঁহারা পুনরায় স্বপদে প্রস্থান করেন। যত দিন তেমন না হন, তত কালের জন্য জীবভাবে বিচরণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। শুক ও অশ্বত্থামা উভয়েই রুদ্রাবতার, তন্মধ্যে ব্যাসনন্দন শুক, স্বপদে প্রস্থান করিয়াছেন, অশ্বত্থামা এখনও মর্ত্ত্যধামে চিরজীবী নামে খ্যাত আছেন। পরশুরাম, দাশরথিরাম, (বেদব্যাস) কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, ও দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ইহারা সকলেই বিষ্ণুর অবতার, তথাপি দাশরথি রাম ও দেবকীসুত কৃষ্ণ, বিষ্ণুতে পুনঃ প্রবেশ করিয়াছেন কিন্তু পরশুরাম ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ, এখনও মর্ত্ত্যদেহে চিরজীবী আছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

অনেকের ধারণা আছে যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা রুদ্রের পদ হইতে কেহ অবতার হইলে পূর্ব্বপদ খালি থাকিয়া যায়, কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভ্রমমূলক। ব্রহ্মাদি ঈশ্বরেরা আপন আপন পদ ছাড়িয়া অবতার হন না; বরং স্বপদে থাকিয়াই আপন বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার জন্য বিশেষ বিশেষ দেহের মধ্যে ঐশী শক্তির দ্বারা, সেই প্রবৃত্তির সমাবেশ করতঃ পৃথক্ ব্যক্তির ন্যায় প্রাদুর্ভূত হন। এই ভাবে শরীর পৃথক্ হইলেও চিত্ত একই থাকিয়া যায়। অবতারের অন্তঃকরণ, সেই মূল চিত্তদ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। এজন্য অবতারকে পূজা করিলে, উহা যে পদ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে, সেই মূল পদেরই পূজা করা হয়।

আমাদের মধ্যে যে নানা সময়ে সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তিসমূহের উদয় হইয়া থাকে, আমরা যদি ঐ সকল প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য তদনুরূপ দেহ গঠন পূর্ব্বক, প্রবৃত্তিগুলিকে আমাহইতে পৃথক্ করিয়া চালাইতে পারিতাম, তবে, সেই সকল গঠিত দেহগুলিকে আমাদের

অবতার বলা যাইত। এই ভাবে ব্রহ্মাদির অবতার-ভাব বুঝিতে হইবে।

অবতারেরা মনুষ্যাদি দেহধারণ করিলেও তাহাতে বিশেষত্ব বজায় থাকে। উত্তপ্ত রক্তবর্ণ লৌহখণ্ড, যেমন লৌহ ও অগ্নি এই উভয় ভাবাপন্ন হয়, তেমন অবতারের মধ্যেও, মনুষ্যাদিভাবের এবং ঈশ্বরভাবের সমাবেশ বুঝিতে হইবে। তাহাতেই মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—"নায়ং কেবল-মানুষঃ।" অর্থাৎ ইনি কেবল মানুষ নহেন। শিবপুরাণে রুদ্রাবতারের প্রতিও ঠিক এই কথা প্রযুক্ত হইয়াছে। আবার অবতারের পূর্ব্বপদ লক্ষ্য করিয়া বলা হয়—"ব্যাসো-নারায়ণঃ স্বয়ম্।" এখানে যেমন ব্যাস মুনিকে স্বয়ং নারায়ণ বলা হইল, তেমন পরমপদ স্বরূপ সেই চৈতন্যময় মহেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া, 'পূর্ণব্রহ্ম' প্রভৃতি শব্দও বলা গিয়া থাকে। মূর্খেরা ততদুর না জানাতে অবতার বিশেষকে "পূর্ণাবতার" বলিয়া মনে করে।

ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণ, এইরূপে আপন আপন বহির্ম্মুখবৃত্তিগুলিকে ক্ষয় করিয়া, যখন সমস্ত সংস্কার ধ্বংস করিয়া উঠেন, তখন তাঁহারা মহেশ্বরে মিশিয়া শিব হইয়া থাকেন। তাহা হইলে আর সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ব্যাপারের সহিত সম্বন্ধ থাকে না।

বিষ্ণু।

কপিলকৃত সাংখ্যে যে পঞ্চবিংশতত্ত্বস্বরূপ পুরুষের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইয়াছে, তত্রত্য পুরুষ-শব্দদ্বারা শাস্ত্রোক্ত বিষ্ণুকে বুঝিতে হয়। মহাভারতে কথিত আছে—

পঞ্চবিংশতিমোবিষ্ণুর্নিস্তত্ত্বস্তত্ত্বসংজ্ঞিতঃ॥

চব্বিশতত্ত্বের অতীত পঞ্চবিংশ বিষ্ণু, তত্ত্বাতীত হইলেও (তত্ত্বসমূহ-মধ্যে প্রবিষ্ট থাকাতে) তত্ত্বসংজ্ঞায় অন্তর্গত হন। [বিষ্ণুতে জীবভাব ও শিবভাব উভায় বিদ্যমান থাকাতে ইহাকে তত্ত্ব এবং তত্ত্বাতীত উভয়ই বলা যায়] ফলতঃ সমস্ত জীবের সমষ্টিকেই বিষ্ণু বলিয়া বুঝিতে হয়। কিন্তু সমস্ত জীবের সমষ্টিকে শিব বলা যায় না। দেহসম্বন্ধ থাকিতে শিবত্ব ঘটিতে পারে না—কিন্তু রুদ্রত্ব হইতে পারে। সুষুপ্তি ও মৃত্যুতে জীবগণ, শিবের সহিত মিলিয়া থাকিলেও ভাবিদেহ-সম্ভাবনা থাকাতে সম্যক্ প্রকারে মিশ্রিত হইতে পারে না। এদিকে দেহধারী প্রত্যেক জীবকেই বিষ্ণুর অংশ সুতরাং বিষ্ণু বলা যাইতে পারে। যথা—

"মমৈবাংশোজীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" গীতা

জীবসমূহের মধ্যে প্রত্যেক জীবই আমার চিরস্থায়ী অংশ বলিয়া গণ্য।

এইরূপে সমস্ত জীবই বিষ্ণু অর্থাৎ সাংখ্যোক্ত পুরুষ হওয়াতে, কপিল-কৃত সাংখ্যশাস্ত্রে পুরুষের বহুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এই হিসাবে ধরিতে গেলে আমাদের মস্তক ও হস্তপদাদি বিষ্ণুর বা পুরুষের মস্তক ও হস্ত-পদাদি বলিয়া গণ্য হয়। আমাদের এক শিরঃ, দুই হস্ত, দুই পদ, সুতরাং সমষ্টিপুরুষ বিষ্ণুর অসংখ্য শির ও হস্তপদাদি না হইয়া পারে না। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত-মন্ত্রে (সহস্রশীর্ষাপুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।) অসংখ্যার্থে সহস্রশব্দ প্রয়োগ করিয়া সহস্রমস্তক, সহস্র চক্ষুঃ, সহস্র পদবিশিষ্ট পুরুষ কীর্ত্তিত হইয়াছেন। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বিষ্ণুকে স্নান করান হয়।

বিষ্ণুপুরাণে, দেবতা মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জীবরূপে বিষ্ণুর স্তব দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বিষ্ণুপুরাণের, তৃতীয় অংশের সপ্তদশ অধ্যায়ে কথিত আছে যে, পূর্ব্বকালে দেবাসুরে ঘোরযুদ্ধ হইয়া প্রহ্লাদের ভ্রাতা হ্লাদ প্রভৃতি

কর্ত্তৃক দেবগণ পরাজিত হন। তখন নিরুপায় হইয়া ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তরকূলে গমন পূর্ব্বক সমস্ত দেবতা,বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন।

দেবাউচুঃ।

আরাধনায় লোকানাং বিষ্ণোরীশস্য যাং গিরম্।
বক্ষ্যামো ভগবানাদ্যস্তয়া বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥ ১১।

দেবতারা বলিলেন—লোকদিগের ঈশ্বর—বিষ্ণুর আরাধনার জন্য আমরা যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিব, তদ্দ্বারা ভগবান্ আদ্য বিষ্ণু প্রসন্ন হউন।

এখানে "আদ্য-বিষ্ণু" কথায় চতুর্ব্বিংশতত্বের অতীত পুরুষকে বুঝাই-তেছে। সকল জীবই যখন—বিষ্ণু, তখন আদ্য বিষ্ণু না বলিয়া, যে কোন বিষ্ণু প্রসন্ন হউন বলিলে, কোন ফলের আশা ছিল না ; কারণ—অসুররূপী বিষ্ণু ত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াই প্রসন্ন হইয়াছেন। এজন্য আদ্য বিষ্ণুকে প্রসন্ন করা হইতেছে। এই দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুও স্তব করিতে ছিলেন। তিনিত আর আদ্য বিষ্ণু নহেন,—কশ্যপ ও অদিতি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া অবতার বিষ্ণু হইয়াছেন।

ত্বমুর্ব্বী সলিলং বহ্নিবায়ুরাকাশমেবচ।
সমস্ত-মন্তঃকরণং প্রধানং তৎপরঃ পুমান্ ॥

তুমি ক্ষিতি অপ্‌তেজ মরুৎব্যোমময় স্থূল দেহ ; তুমি সমস্ত অন্তঃকরণ রূপ সূক্ষ্ম শরীর, এবং প্রধান (অব্যক্ত) নামক কারণশরীরও তুমিই। এই সমস্তের অতীত পুরুষই তোমার মূল স্বরূপ।

শক্রার্ক রুদ্রবস্বশ্বিমরুৎসোমাদিভেদবৎ।
বয়মেব স্বরূপং যৎতস্মৈ দেবাত্মনে নমঃ ॥

ইন্দ্র, সূর্য্য, রুদ্র, বসু, অশ্বিনীকুমার, মরুৎ, সোম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন

নাম ও রূপ বিশিষ্ট আমরা অর্থাৎ দেবতাগণ, যে তোমার বিশেষ বিশেষ স্বরূপ হইতেছি, এই সকল দেবরূপধারী তোমাকে নমস্কার করিতেছি।

এখানে দেবতাগণ, আপনাদিগকে বিষ্ণুর স্বরূপ জানিয়া আপনারাই আপনাদিগকে নমস্কার করিয়া বিষ্ণুর তুষ্টি সাধন করিতেছেন। এ রহস্য এখন অল্পবুদ্ধি মনুষ্য কি বুঝিবে? তাহারা জানে আমরা ভগবানের উপায়হীন প্রজা বলিয়া ভগবান্‌কে তোষামোদ করিতে হয়। উপাসনাতে যে জ্ঞান বিজ্ঞানের আবশ্যকতা হয়, এখনকার সভ্যজগৎ তাহা বিদিত নহেন। দেবতারা জ্ঞান বিজ্ঞান বলে আপনাদিগের বিষ্ণুত্ব বুঝিতে পারিয়াই দেবত্বলাভে সমর্থ হইয়াছেন। এক্ষণকার সভ্যগণ তাহা না বুঝিতে পারাতে ম্লেচ্ছ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

দম্ভপ্রায়মসম্বোধি তিতিক্ষাদমবর্জ্জিতম্।
যদ্রূপং তব গোবিন্দ! তস্মৈ দৈত্যাত্মনে নমঃ॥

হে গোবিন্দ! দম্ভযুক্ত সম্যগ্‌-বোধবিহীন তিতিক্ষা ও দমগুণ বর্জ্জিত দৈত্য মূর্ত্তিতে তুমি আমাদিগকে পরাজয় করিয়াছ সেই দৈত্যরূপী বিষ্ণুকে প্রণাম করিতেছি।

পৃথিবীতে হিন্দু ভিন্ন কোন্ জাতি শত্রুকেও উপাস্যদেবতা বলিয়া প্রণাম করিতে পারে? ম্লেচ্ছ দিগের নিকট গড্ (god) পূজ্য, সয়তান হেয়; হিন্দু কিন্তু সেই সয়তান্ স্বরূপ দৈত্যকে ঈশ্বরের মূর্ত্তি বলিয়া নমস্কার করে।

ক্রৌর্য্যমায়াময়ং ঘোরং যচ্চরূপং তবাসিতম্।
নিশাচরাত্মনে তস্মৈ নমস্তে পুরুষোত্তম॥

হে পুরুষোত্তম! তুমি রাক্ষস মূর্ত্তিতে ক্রূরতা ও মায়ার আধার স্বরূপ ঘোর তমোময় ভাব ধারণ করিয়াছ সেই নিশাচর মূর্ত্তিতে তোমাকে নমস্কার করি।

অতিতিক্ষাধনং ক্রূরমুপভোগময়ং হরে।
দ্বিজিহ্বং তব যদ্রূপং তস্মৈ সর্পাত্মনে নমঃ॥

হরি, তোমার ক্ষমাহীন ক্রূর ও উপভোগময় দ্বিজিহ্বা বিশিষ্ট যে রূপ রহিয়াছে, সেই সর্পমূর্ত্তিতে তোমাকে নমস্কার।

প্রবৃত্ত্যা রজসো যচ্চ কর্ম্মণাং কারকাত্মকম্।
জনার্দ্দন নমস্তস্মৈ ত্বদ্রূপায় নরাত্মনে॥

জনার্দ্দন! রজোগুণের প্রবৃত্তি হেতু যাহারা কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, এবম্বিধ মানব জাতিও তোমার মূর্ত্তি বই নহে; সেই নররূপে তোমাকে নমস্কার করিতেছি।

এখানে দেবতারা মনুষ্যদিগকে প্রণাম করিতেছেন। মনুষ্য বলিতে ব্রাহ্মণ হইতে অসভ্য যবন ম্লেচ্ছ পর্য্যন্ত সকলেই গণ্য। শিক্ষিতেরা বলেন হিন্দুদের মধ্যে বড় সঙ্কীর্ণতা। কোন্ জাতির উপাস্য দেবতারা, সকল জাতীয় মনুষ্যকে প্রণাম করিতে পারে?

অষ্টাবিংশদ্বধোপেতং যদ্রূপং তামসং তব।
উন্মার্গগামি সর্ব্বাত্মন্ তস্মৈপশ্বাত্মনে নমঃ॥

হে সর্ব্বাত্মন্! তুমি তমোগুণে আটাশ প্রকার অক্ষমতা যুক্ত উন্মার্গগামী পশু হইয়া বিচরণ করিতেছ; সেই পশুরূপে তোমাকে নমস্কার।

এই পশুগুলিও বিষ্ণু, যজ্ঞও বিষ্ণু; এজন্য যজ্ঞার্থে পশুবধ, বধ বলিয়া গণ্য নয়।

যজ্ঞাঙ্গভূতং যদ্রূপং জগতঃ সিদ্ধিসাধনম্।
বৃক্ষাদিভেদৈর্ষদ্ভেদি তস্মৈ মুখ্যাত্মনে নমঃ॥

জগতের সিদ্ধি সাধন জন্য উদ্ভিদ্ জাতি যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ গণ্য, বৃক্ষ লতা গুল্ম প্রভৃতি নানারূপে বিরাজিত, সেই মুখ্য-সৃষ্টি স্থাবররূপী বিষ্ণুকে প্রণাম করি।

তির্য্যঙ্মানুষদেবাদি ব্যোমশব্দাদিকঞ্চ যৎ।
রূপংতবাদেঃ সর্ব্বস্ত তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ॥

তির্য্যক্, মনুষ্য, দেবতা প্রভৃতি প্রাণী, ব্যোম শব্দ প্রভৃতি (চব্বিশ-তত্ত্ব), যত কিছু আছে, সমস্তই সেই আদি পুরুষের (পঞ্চবিংশতত্ত্বের) রূপ মাত্র। এজন্য তোমাকে "সর্ব্ব" বলিতে হয়। অতএব সকলের আত্মা স্বরূপ তোমাকে প্রণাম করি।

দেবগণ, পুরুষ ও প্রকৃতির ভাব বিদিত থাকাতেই বিষ্ণুকে সর্ব্বজীব-ময় বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন এবং সেই ভাবে স্তব করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

অজ্ঞ মনুষ্যদিগের মধ্যে এতাদৃশ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা না থাকাতে তাঁহারা ব্যক্তি বিশেষকে বিষ্ণু বলিয়া পূজা করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে বুদ্ধিমান লোকেরা যাহাকে জীব বলিয়া বুঝেন, তত্ত্বদর্শী জ্ঞানবানেরা তাহাকেই চৈতন্যস্বরূপ শিব জানিয়া থাকেন ; এখানেও তেমন, অজ্ঞেরা বিষ্ণুকে রূপবান্ ব্যক্তি বিশেষ মনে করেন, জ্ঞানীরা তাঁহাকেই সাংখ্যোক্ত পুরুষ বলিয়া গ্রহণ করেন। এইরূপে জ্ঞানী ও অজ্ঞের ভাবানুসারে একই বিষ্ণুর দ্বিবিধ রূপ ধরা গিয়া থাকে, যথা—

শ্রীভগবান্ উবাচ।

সামান্যং পরমঞ্চৈব দ্বেরূপে বিদ্ধি মেঽনঘ।
পাণ্যাদিযুক্তং সামান্যং শঙ্খচক্রগদাধরম্॥ ২৯
পরংরূপমনাদ্যন্তং যন্মমৈকমনাময়ম্।
ব্রহ্মাত্ম-পরমাত্মাদি-শব্দৈনৈতদুদীরতে॥ ৩০
যাবদপ্রতিবুদ্ধস্ত্বমনাত্মজ্ঞতয়া স্থিতঃ।
তাবচ্চতুর্ভুজাকারদেবপূজাপরোভব॥ ৩১

যোগবাশিষ্ঠ নির্ব্বাণ প্রঃ ৬০ সর্গঃ।

শ্রীভগবান বলিলেন—হে নিষ্পাপ! আমার সামান্য ও পরম এই দুইটী রূপ আছে; তন্মধ্যে হস্তপদাদি সংযুক্ত শঙ্খচক্রগদাদি বিশিষ্ট মূর্ত্তিকে সামান্য রূপ বলিয়া জানিও; আর অনাদ্যনন্ত, অনাময়, ব্রহ্ম, আত্মা, পরমাত্মা প্রভৃতি শব্দ দ্বারা যে আমার অদ্বৈতভাবের কীর্ত্তন হয়, তাহাই—আমার পরম রূপ। তুমি যতদিন অজ্ঞ থাক এবং সেই রূপ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হও, ততকাল আমার চতুর্ভুজাকার দেবমূর্ত্তির পূজা করিবে।

এতদ্দ্বারা একই বিষ্ণুর দেবতারূপও ঈশ্বররূপের পরিচয় পাওয়া গেল। এই ভাবে ব্রহ্মার মালাকমণ্ডলুহস্ত চতুর্ম্মুখ মূর্ত্তি এবং রুদ্রের ত্রিশূলধারী পঞ্চমুখ মূর্ত্তিকে দেবতারূপ বুঝিতে হইবে। পরমরূপ তিনেরই এক। এতক্ষণ ঈশ্বররূপের কথা বলা হইল, অতঃপর দেবতা রূপের প্রসঙ্গ করা যাইতেছে।

দেবতা।

ব্রহ্মাদি ঈশ্বরদিগের পূর্ব্বোক্ত অবতার-মূর্ত্তি ভিন্ন মনুষ্যাদিও উন্নত হইয়া দেবতা-রূপে জন্মগ্রহণ করে। নব্যেরা জানেন—মনুষ্য জাতির ন্যায় বুদ্ধি ও ক্ষমতাশালী প্রাণী আর দ্বিতীয় নাই; বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য ম্লেচ্ছগণ, তাহার পরাকাষ্ঠা পাইয়াছেন। সাধু সিদ্ধ মহাপুরুষ-দিগের মধ্যে যে অনেকের আকাশগমন, দূরশ্রবণ, অন্তর্দ্ধান প্রভৃতি বহুবিধ ক্ষমতা বিদ্যমান আছে এবং পরশুরাম, ব্যাস, অশ্বত্থামা প্রভৃতি চিরজীবিগণ যে অদ্যাপি মর্ত্ত্য-দেহে বিচরণ করিতেছেন, এই সকল কথা এক্ষণকার অনেকে স্বীকার করিতে পারেন না,—দেবতাদিগের বৃত্তান্ত

কিরূপে বুঝিবেন ? কথিত মহাপুরুষেরা যে আমাদের সমাজ অতিক্রম করতঃ দেবলোকের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন !

দেবতাগণ আমাদিগের অপেক্ষা বুদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন ; দেব-লোকে আকাশ-গমন, দূর-শ্রবণ, অন্তর্দ্ধান, পরকায়-প্রবেশ, অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি সিদ্ধি সকল পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান আছে। তাহাতেই দেবতারা অদৃশ্যভাবে থাকিয়া, আমাদের সহিত স্বকীয় পদোচিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছেন। দেবতাদিগের বিশেষানুগ্রহ না হইলে আমরা তাঁহাদের দর্শন পাইতে পারি না। দেবদেহ, পশু পক্ষ্যাদির ন্যায় ভূমির সমান্তরাল নহে, বরং মানব-দেহের মত উন্নত অর্থাৎ সোজা। দেবসমাজও অনেকটা হিন্দুসমাজের অনুরূপ। দেবতাদিগের মধ্যেও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি মূল-বর্ণ এবং এতদ্বহির্ভূত নানা জাতি রহিয়াছে। সুতরাং দেবলোকে যুদ্ধবিগ্রহ, দণ্ডনীতি প্রভৃতি কিছুরই অভাব নাই।

অজ্ঞেরা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সংস্কার অনুসারে ও ইহজন্মের বাহ্য শিক্ষার বলে চালিত হয়। বিজ্ঞেরা শাস্ত্র-পাঠপূর্ব্বক দেবতত্ত্ব বিদিত হন এবং যেরূপ বিজ্ঞানাশ্রয় করিয়া দেবতারা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, তাদৃশ বিজ্ঞান অর্জ্জন করিতে যত্ন করেন।

ম্লেচ্ছাদি জাতির শাস্ত্রবল নাই। তাহাদের মধ্যে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ দেখা যায়, তাহাও ম্লেচ্ছ বিশেষের মত বই নহে। সেই সকল ম্লেচ্ছ মত অনুশীলন করিলে ম্লেচ্ছতাই ঘটে। তদনুসারে মরণান্তে প্রেতত্ব ভিন্ন দেবত্বাদি লাভের আশা নাই।

শাস্ত্রমতে মনুষ্য, মরণান্তে দেবত্ব লাভ করিতে পারে, যেমন নহুষ রাজা ইন্দ্র নামক দেবতা হইয়া ছিলেন, ম্লেচ্ছ-গ্রন্থমতে খ্রীষ্টান মরিয়া তেমন গড্ হইতে ও মুসলমান আল্লা হইতে পারে না।

হিন্দু যেমন সমস্তই জীব বলিয়া জানে, পঞ্চবিংশতত্ত্ব স্বরূপ পুরুষকেও জীব সমষ্টি বলিয়া বুঝিতে পারে, ম্লেচ্ছ এ বিজ্ঞানে প্রবেশ করিতে সমর্থ নহে। এমন বিজ্ঞান পাইলে তাহাদের ম্লেচ্ছত্ব ঘুচিয়া যাইত।

তাহাদের গড্ খোদা প্রভৃতি বোধ হয় কোন জীব নহে। তাদৃশ কোন প্রাণী জগতে বিদ্যমান থাকিলে, হিন্দু তাহা দিগকেও বিষ্ণু বলিয়া প্রণাম করিতে পারিত। যীশু ও মহম্মদের কল্পনা ছাড়া গড্ ও খোদার কোন যথার্থ অস্তিত্ব থাকিলে, হিন্দু তাহাকে উপেক্ষা করিবে কেন? হিন্দুর দেবতারা, রাক্ষস মনুষ্য পশু সর্প বৃক্ষাদিকে ও বিষ্ণুর বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তি বলিয়া নমস্কার করিলেন, আমরা কি ম্লেচ্ছের উপাস্যকে বিষ্ণু বলিয়া ভজনা করিতে কুণ্ঠিত হইতাম? তাহা হইলে এত গোলযোগে পড়িতে হইত না।

হিন্দু জানে—ম্লেচ্ছগণ বহুজন্মের পরে হিন্দু হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারিবে, তখন শাস্ত্রের অধিকারী হইলে, শাস্ত্রানুরূপ বিজ্ঞানাশ্রয় করিয়া হিন্দুর উপাস্য দেবতা হওয়াও অসম্ভব নহে। ম্লেচ্ছ যে তাহার উপাস্য রূপে পরিণত হইতে পারে, এ কথা ম্লেচ্ছ গ্রন্থেই নাই। এজন্য হিন্দু ম্লেচ্ছবিজ্ঞানের পক্ষপাতী নহে।

পূর্ব্ব প্রবন্ধের স্তব-পাঠে বুঝা যায়, ইন্দ্রাদি দেবতারা সাংখ্যের বিজ্ঞান জানিতেন। সাংখ্যোক্ত পুরুষ বা বিষ্ণু ভিন্ন, আর কাহাকে সর্ব্ব প্রাণীরূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে? তাঁহারা জগতের সকলকে ও আপনা দিগকে সেই বিষ্ণু বলিয়া জন্মান্তরে বিজ্ঞান লাভ করিয়া ছিলেন, তাহাতেই মরণান্তে দেবতা হইতে পারিয়াছেন এবং সেই বিজ্ঞানানুরূপ বিষ্ণুর স্তব করিয়াছেন।

হয়ত অসুরদিগের মধ্যে এতাদৃশ বিজ্ঞান প্রচলিত নাই। অসুরেরাও, দেবতাদিগের জ্ঞাতি ও নিম্নশ্রেণীর দেবতা। আমাদের মধ্যে

যেমন জ্ঞানবানেরা "শিবোঽহং", "নারায়ণো ঽহং", আমি-শিব, আমি-নারায়ণ বলিয়া সাধন করেন, আর অন্তেরা "আমি-অধম" "আমি তোমার দাস" বলিয়া ভজন করিয়া থাকেন, মোটের উপর এই দুই ভাবের উপাসক পাওয়া যায়, দেবলোকেও ইহাদের পরিণতিস্বরূপ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর দেবতার অস্তিত্ব জানা যায় ; যথা—ভোক্তা দেবতা ও ভোগ্যদেবতা। ইন্দ্র—ভোক্তা দেবতা, আর শচী ও ইন্দ্র-সভার চিত্ত-বিনোদক গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, কিন্নর প্রভৃতি—ভোগ্য দেবতা। ইহাঁরা ইন্দ্রের ভোগের জন্য দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ সূর্য্য—ভোক্তা দেবতা। সংজ্ঞা, ছায়া প্রভৃতি সূর্য্যপত্নীগণ ও অরুণ—সারথি, এবং বিশেষ বিশেষ গন্ধর্ব্ব ও নাগগণ, সূর্য্যের ভোগ্য দেবতা স্বরূপ অবস্থান করেন। এই প্রকার বৈকুণ্ঠের বিষ্ণু—ভোক্তা দেবতা ; লক্ষ্মী, সুনন্দ, বিশ্বক্সেন প্রভৃতি তদীয় ভোগ্য দেবতা স্বরূপ বিরাজিত আছেন।

বেদশাস্ত্রে, বিদ্যাদ্বারা দেবত্ব প্রাপ্তি হয় বলিয়া শ্রুতি আছে। আবার যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা, দেবলোক প্রাপ্তির বিধানও জানা যায়। শেষোক্তেরা কর্ম্ম-দেব নামে খ্যাত। এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে—যাঁহারা প্রকৃতি পুরুষের বিভাগ, বিদ্যা দ্বারা অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা মরণান্তে দেবলোকে গিয়া, ভোক্তা দেবতা রূপে জন্মলাভ করেন। আর যাঁহাদের তাদৃশ বিদ্যা না জন্মে, সাধন ভজন দ্বারা তাঁহারা যদি দেবলোক প্রাপ্তির যোগ্য হন, তবে দেবলোকে যাইয়া পূর্ব্বোক্ত ভোগ্য দেবতা বা কর্ম্ম দেবতা বলিয়া জন্মগ্রহণ করেন। এই শ্রেণীর ব্যক্তিরাই বিষ্ণুর পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপ পুরুষভাব বুঝিতে না পারিয়া, দেব বা মনুষ্য লোকে যাঁহারা বিষ্ণুর অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকেই সেই পরমপুরুষ বিষ্ণু বলিয়া আরাধনা করিয়া থাকেন। [১২৪ পৃঃ দ্রঃ]

এতদুপলক্ষে দৈত্যশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ বিষ্ণুর স্তব করিতে করিতে বলিয়াছিলেন।

যস্যাবতাররূপাণি সমর্চ্চন্তি দিবৌকসঃ।
অপশ্যন্তঃ পরং রূপং নমস্তস্মৈ মহাত্মনে॥

বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ ১৯শ অধ্যায়।

কর্ম্মদেবতারা যে বিষ্ণুর পরমরূপ দেখিতে অসমর্থ হইয়া অবতার রূপের সমর্চ্চনা করেন, সেই মহাত্মা বিষ্ণুকে নমস্কার।

আরও বুঝা যায় অসুর-সমাজেও, বিষ্ণুর সর্ব্বাত্ম ভাব প্রচার নাই। নতুবা অসুরগণ এত বিষ্ণুদ্বেষী হইবেন কেন?

ফলতঃ সাংখ্যতত্ত্বানুসন্ধান ভিন্ন আপনাকে ও অন্যান্য জীবকে, সেই তত্ত্বাতীত পুরুষেরই প্রকৃতি-আশ্রিত-অবস্থা বলিয়া জ্ঞানলাভ করার সহজ উপায় দেখা যায় না।

প্রাচীন পণ্ডিতগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানানুশীলন দ্বারা প্রকৃতি পুরুষের যথার্থ ভাব অনুভব করিতেন। বিষ্ণু সর্ব্বজীব স্বরূপ হওয়াতেই, যজ্ঞে পশু বধ করার ব্যবস্থা বেদশাস্ত্রে কথিত হয়। যথা—

"যজ্ঞেন যজ্ঞময়জন্তঃ"..."অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্।"

ঋগ্বেদ, পুরুষ সূক্ত।

যজ্ঞও—পুরুষ, পশুও—পুরুষ; অতএব পশুরূপ পুরুষকে বধ করিয়া যজ্ঞরূপ পুরুষের পূজা করিয়াছেন।

নরমেধযজ্ঞে বলিযোগ্য পুরুষকে, উক্ত পুরুষসূক্তের মন্ত্র দ্বারা স্তব করা হইয়া থাকে।

তাহার ভাব এই যে—জগতের সমস্ত পদার্থই পুরুষ বা বিষ্ণু; তুমি পশুরূপী বিষ্ণু, যজ্ঞরূপী বিষ্ণুতে পরিণত হইতেছ; তুমি অধম বিষ্ণুত্ব

ছাড়িয়া উত্তম বিষ্ণুতে যাইতেছ, সুতরাং তোমার প্রকৃত প্রস্তাবে বধ হইতেছে না। অতএব যজ্ঞ উপলক্ষে বধ,—বধই নহে। মন্ত্রোচ্চাচরণ দ্বারা এক পুরুষেরই যজ্ঞমূর্ত্তি ও পশুমূর্ত্তি অবধারণ স্মরণ করিতেছি, সুতরাং বধের পাতক আমাদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে না। মন্ত্র উচ্চারণদ্বারা এই ভাবটী হৃদয়ে স্থাপনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় হয়।

বিষ্ণু, কৃষ্ণাবতারে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সময়ে, আপনার বিষ্ণুত্ব স্মরণ পূর্ব্বক এতাদৃশ হেতু দর্শাইয়া, অর্জ্জুনকে আত্মীয় স্বজন বধে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। তখন বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে—

হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে।

এই ভাব বুঝিয়া চলিলে সমস্ত লোককে বধ করিলেও, বধ করিল বলা যায় না ও বধজনিত পাতকে বদ্ধ হয় না।

প্রাচীন হিন্দুগণ, মৃত্যু ও পরলোকের বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত থাকাতে, যে মৃত্যুতে পরকালে স্থায়ী মঙ্গল ঘটিবে জানিতেন, তাহা আপনার ও অন্যের জন্য প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাহাতেই তাঁহারা সহমরণ ও তুষানল আদি অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছেন। রাজ্য ত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থানে দেহ-পাত করিলেন। দধীচি মুনি, বজ্র নির্ম্মাণের জন্য দেবোদ্দেশে শরীর ছাড়িয়া দিতে পারিলেন। তাদৃশ যজ্ঞীয় বিজ্ঞান অবলম্বন পূর্ব্বক পশু বলিদানে যজমান্ ও পশুর স্বর্গলাভ ব্যাপার আমরা না বুঝিলেও তাঁহারা বুঝিতেন, তেমন করিয়াই সাধ্য নামক দেবতাগণ অদ্যাপি স্বর্গভোগ করিতেছেন। অন্য যাঁহারা বিজ্ঞান না বুঝিয়া কেবল বেদপ্রমাণে যজ্ঞাদি পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা বিদ্যাহীন কর্ম্মদ্বারা ভোক্তাদেবতা না হইয়া বরং ভোগ্যদেবতা হইয়া থাকেন।

বিষ্ণুলোক।

প্রশ্ন—বিষ্ণু যখন সর্ব্বত্র সর্ব্বরূপে বিরাজ করিতেছেন, তখন বিষ্ণু লোক বলিয়া বিশেষ স্থান থাকার সম্ভাবনা কি ? ইতি।

শম্ভুচন্দ্র।

উত্তর—আমরা মর্ত্ত্যলোকে বা নরলোকে থাকিয়া শাস্ত্র চক্ষুঃ ভিন্ন বিষ্ণুলোক দর্শন করার আশা করিতে পারি না। [বিষ্ণুর দ্বিবিধ রূপের বিষয় ১২৪ ও ১২৫ পৃঃ দ্রঃ]

বিষ্ণু মর্ত্ত্যলোকে অনেক অবতার গ্রহণ করিয়া বিশেষ বিশেষ কঠিন কার্য্য সমাধা করতঃ স্বপদে পুনঃ প্রস্থান করিয়াছেন। এজন্য নরলোকে বিষ্ণুলোক দেখা যায় না। সেই বিষ্ণু দেবলোক মধ্যেও অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাদৃশ দেবাবতারের অনেক শরীর অদ্যাপি পরিত্যাগ না করাতে বিদ্যমান রহিয়াছে। অন্তর্দ্ধান-বিদ্যার বলে সেই দেহ অনেক সময়ে অদৃশ্য হইলেও, ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য ভক্তের প্রার্থনা দ্বারা তাহা পুনঃ পুনঃ বিকাশ করিয়া থাকেন। বিষ্ণু যে সকল ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে এতাদৃশ লীলামূর্ত্তি সকল আবির্ভূত করেন, সেই ভক্ত সমাজকে বিষ্ণুলোক বলা যায়। বৈকুণ্ঠ ও গোলোক এক একটী বিষ্ণুলোক বলিয়া গণ্য।

বিষ্ণু অন্য সর্ব্বত্র সকলের জীবরূপে বিদ্যমান থাকিলেও, বিষ্ণুলোকে তদতিরিক্ত লীলাবিগ্রহ ধারণপূর্ব্বক ভক্তমণ্ডলীর সহ বিবিধ আমোদ প্রমোদ ও ক্রিয়া কৌতুক করিয়া থাকেন।

ইতি ব্রহ্মানন্দ।

বৈষ্ণব দিগের মধ্যে যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব নামক পঞ্চভাব সাধনের ব্যবস্থা আছে, তদ্দ্বারা কেহ আপনাকে ভগ-

বানের দাস, কেহ শ্রীদাম সুবলের ন্যায় সখা, কেহ রাধিকার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী বলিয়া সাধন করতঃ, হৃদয়ে তদনুরূপ সংস্কার অর্জ্জন করেন। তাঁহারা সাযুজ্য মুক্তি চাহেন না। এতাদৃশ সংস্কার প্রকৃত প্রস্তাবে অর্জ্জিত হইলে, তাঁহারা মরণান্তে বিষ্ণুর কৃষ্ণাদি রূপ বিশেষের সালোক্য, সারূপ্য ও সামীপ্য পর্য্যন্ত পাইতে পারেন। বিষ্ণুর সেই কৃষ্ণাদি মূর্ত্তি, যে গোলোকাদিতে বাস করিয়া থাকে, উক্ত পঞ্চপ্রকার ভাবসাধকেরা যোগ্য হইলে মরণান্তে সেই লোকের বৃক্ষলতাদি হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারিলেই 'বিষ্ণুসালোক্য পাইয়াছেন' বলা যায়। আর বিষ্ণুলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া বিষ্ণুর মত শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ দেহ প্রাপ্ত হইলেই, সমান রূপ এই অর্থে 'সারূপ্য মুক্তি পাইলেন' বলে। তাহার পরে বিষ্ণুর নিকটবর্ত্তী হওয়ার অধিকার পাইলে 'সামীপ্য মুক্তি' বলিতে হয়।

সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য এই চতুর্ব্বিধ মুক্তির মধ্যে প্রথমোক্ত তিন প্রকার মুক্তি পাইতে আত্মজ্ঞানের আবশ্যক করে না; কিন্তু আত্ম-জ্ঞান ভিন্ন বিষ্ণুর সাযুজ্য লাভ ঘটে না।

যাহারা (দাস, সখা বা পত্নীভাবে) আমি এক বস্তু ও উপাস্যদেবতা অন্য বস্তু বলিয়া সাধন করে তাহারা অজ্ঞ এবং মরণান্তে দেবতাদিগের ভোগের উপকরণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয় এরূপ কথা বেদে শুনা গিয়াছে। যথা—

যথাপশুরেবং স দেবানাং ভবতীতি।

যাহারা উপাস্যদেবতাকে অন্য ও আপনাদিগকে অন্য বলিয়া ভাবনা করে, তাহারা তত্ত্ব জানিতে পারে না। মনুষ্যদিগের মধ্যে যেমন হস্তী, ঘোটক, উষ্ট্র প্রভৃতি পশু, ভোগের বিষয় স্বরূপ আদৃত হয়, এইরূপ তাহারা দেবতাদিগের ভোগ্য বস্তু (পশু) রূপে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করে।

শঙ্করাচার্য্য এখানে পশু শব্দে ভোগ্য মাত্র অর্থ করিয়া পত্নীকেও পশু সংজ্ঞার অন্তর্গত দেখাইয়াছেন।

উক্তরূপ পশুভাব সাধক বৈষ্ণবেরা, যদি মরণের পর গোলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহ কৃষ্ণের দাস, কেহ সখা, কেহ বা রাধা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের ভোগোপকরণ স্বরূপ বিরাজ করেন, তবে তাঁহারা বেদের প্রয়োগমতে 'শ্রীকৃষ্ণদেবতার পশু হইলেন' বলা যাইবে।

আর যাঁহারা তত্ত্ববিচার দ্বারা আপনাকে বিষ্ণু বলিয়া বিদিত হইতে পারিবেন, তাঁহাদের তাদৃশ পশুত্বের আশঙ্কা নাই;—তাঁহারা বিষ্ণুর সাযুজ্য লাভ পূর্ব্বক বিষ্ণুতে মিশিয়া গিয়া, লক্ষ্মী রাধা প্রভৃতিকে ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন। এখানে দেবতা-প্রবন্ধোক্ত ভোক্তা ও ভোগ্য দেবতাদের সমাবেশ দ্বারা যেমন গোলোকাদি বিষ্ণুলোক রচিত হওয়া বলা গেল, অন্যান্য দেবলোকেরও ঈদৃশ ভাব বুঝিতে হইবে।

স্বয়ং শ্রুতিই অজ্ঞ উপাসকদিগের নিন্দা করিয়া বিদ্বান্ সাধকের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন জন্য, যাহারা উপাস্যকে আপনা হইতে পৃথক্ পদার্থ বলিয়া জানে, এতাদৃশ উপাসকের পশুত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছেন, বহু মনুষ্য যে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া পশুভাব অতিক্রম করে, ইহা দেবতাদিগের অভিপ্রেত নহে। তাহার কারণ এই, যে আমাদের অশ্বগবাদি পশুগুলি, ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়া যে কারণে আমাদের প্রিয় হয় না, পশু-ভাব-বহুল-মনুষ্য-সমাজ, যাহাতে "আমি কে?" এই তত্ত্ব জানিয়া 'তুমি প্রভু—আমি দাস' এই ভাবের, সাধনকে অতিক্রম করে, এটাও দেবতাদিগের ভাল লাগে না। এজন্য, জ্ঞানবানের সংখ্যা কম দেখা যায়।

মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ গীতা।

সহস্র মনুষ্যের মধ্যে একজন সিদ্ধির জন্য যত্ন করিয়া থাকে, তাদৃশ যত্নশীল হইয়া সিদ্ধিলাভ করিলেই যে আত্ম-জ্ঞান হয় এমন নহে ;—সিদ্ধদিগের মধ্যে কেহ বা আমাকে তত্ত্বদ্বারা জ্ঞাত হইতে পারেন।

তন্ত্রশাস্ত্রেও পশুভাবের সাধনকে নিকৃষ্ট সাধন বলিয়া শুনা যায়। এক্ষণকার লোকে "পশুভাবের সাধন" নাম শুনিলেই উহা সাধকদিগের প্রতি গালি বিশেষ মনে করে। তাহাতে প্রবেশ করিলে বুঝা যাইবে জগতের অধিকাংশ সাধকই পশুভাবাপন্ন। শাস্ত্রে প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রভৃতির সাধনকে পর্য্যন্ত পশুভাবে নির্দ্দেশ করে।

পশুভাব সাধনের লক্ষণ—আমি সাধক ; আমার অভীষ্টদেবতা, আমা হইতে শ্রেষ্ঠ সুতরাং আমা হইতে পৃথক্ বস্তু। এক্ষণকার সকলেরই ত এই ভাব।

পশুভাব—ফলাপেক্ষাতে কর্ম্ম করা—ইহাকে সকাম কর্ম্ম বলে। বেদস্মৃতি নির্দ্দিষ্ট অশ্বমেধ, রাজসূয় যজ্ঞাদি যাহা যাহা সংকল্প পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয় তৎসমুদায়ই পশুভাবের অন্তর্গত।

পশুভাব সাধনের ফল—স্বর্গে গিয়া ইন্দ্রবিষ্ণ্বাদি উচ্চদেবতাদিগের সেবক হওয়া, ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে।

এতাদৃশ সাধন করিয়া বাসনাক্ষয় করিলে তত্ত্বজ্ঞান লাভের অধিকার জন্মে। এজন্য দেবলোকেও বিদ্যার্জ্জনের প্রয়াস দেখা যায়।

হিন্দুর কর্ত্তব্য।

তৃতীয়াধ্যায়ে কর্ম্মফলেরই প্রাধান্য প্রদর্শন করা গিয়াছে, ঈশ্বর কেবল কর্ম্মানুযায়ী ফলের প্রয়োক্তা, তদতিরিক্ত কিছু করিতে সক্ষম নহেন। এতদ্দ্বারা ঈশ্বরাদির উপাসনা নিষ্প্রয়োজন প্রতিপন্ন হওয়াতে, এখানে কর্ম্ম ও ঐশী ক্ষমতার সমন্বয় বলা যাইতেছে।

ব্রাহ্ম প্রভৃতি শিক্ষিতগণ সর্ব্বোপরিস্থিত ঈশ্বর (মহেশ্বর বা পরমেশ্বর) ভিন্ন (মনুষ্য ও ঈশ্বরের মধ্যে) আর কোন উপাস্যকে স্থান দিতে চাহেন না। আমরা সেই মহেশ্বরের যে লক্ষণ দেখাইয়াছি, তাহাতে বাস্তবিক কোন ফল লাভের জন্য তাঁহাকে আরাধনা করিতে হয় না। তিনি কেবল চৈতন্যস্বরূপ দ্বিতীয় বিহীন সুতরাং সুষুপ্তি ভাবাপন্ন হওয়াতে আমাদের ন্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তিদিগকে দেখেন না বা জানেন না, নিজে কিছু করিতেও সমর্থ নহেন—তাহা হইলে বিকারযুক্ত হইয়া যান। বাহিরে কর্ম্মময়ী প্রকৃতি দ্বারা যাহা যাহা অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকলই পরমেশ্বর করিলেন বলিয়া লোক সমাজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইরূপ হইবার কারণ এই যে—চুম্বক ইচ্ছাপূর্ব্বক লৌহকে আকর্ষণ করে না কিন্তু তাহারই শক্তিদ্বারা লৌহ আকৃষ্ট হয়, অথচ চুম্বক তাহার খবরও রাখে না; তথাপি আমরা বলিতে বাধ্য হই যে, চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করিয়া থাকে; তেমন মহেশ্বর স্বভাবতঃ নিষ্ক্রিয় হইলেও তাঁহার শক্তি (প্রকৃতি) দ্বারা রচিত জগৎকে, পরমেশ্বর কর্তৃক রচিত বলা হইতেছে; প্রকৃত প্রস্তাবে পরমেশ্বর তাহার খবরও রাখেন না। এজন্য মহেশ্বরের মধ্যে উপাসনাদি পঁহুছিবার ও দয়াদি অনুগ্রহ ভাব থাকিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। অতএব তাঁহার উপাসনা দ্বারা কি হইতে পারে? কিন্তু তা বলিয়া হিন্দুর মধ্যে উপাসনার অভাব নাই। সেই মহেশ্বর ও মনুষ্যদিগের মধ্যে ঈশ্বর ও দেবতা নামধারী বিস্তর জীব রহিয়াছেন।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি ঈশ্বরগণ, মহেশ্বরের ন্যায় দ্বৈতজ্ঞানবিহীন নহেন, তাঁহারা যেমন আপনাদিগকে সেই চৈতন্যময় মহেশ্বর বলিয়া জানেন তেমন আপন আপন দেহ সম্বলিত এই জগৎকেও পৃথক্ বলিয়া উপলব্ধি করিয়া থাকেন। মহেশ্বরের সহিত উক্ত ঈশ্বরদিগের এইটুকু

বিভেদ বলা যায়। তাঁহারা এইরূপে প্রকৃতির অতীত পুরুষ স্বরূপ হওয়াতে প্রকৃতি ও তাঁহাদের শক্তি স্বরূপ হইয়া থাকেন। অতএব সেই প্রকৃতি বা শক্তি দ্বারা ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণ, মনুষ্যাদি জীবের প্রতি নিগ্রহানুগ্রহ করিতে সমর্থ হন। তাঁহারা সেই কর্ম্মময়ী মহাশক্তিকে বহুরূপে বিভক্ত করিয়া দেবলোক প্রস্তুত করিয়াছেন এবং সেই দেবতা দিগের মধ্য দিয়া কর্ম্মময়ী শক্তিকে পরিচালন করিয়া থাকেন। এজন্য আমাদের সহিত দেবতাদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ।

এই সমস্ত ঈশ্বরেরা আপন আপন সত্তা হইতে যে পরিমাণে জগতের পৃথক্ সত্তা অনুভব করেন, সেই পরিমাণে আপন আপন সত্তাকে খর্ব্ব করিয়াছেন বলা যায়। মহেশ্বর জগৎকে না দেখাতে যেমন পূর্ণরূপে বিরাজ করেন, দ্বৈত-দর্শন হেতু ইঁহাদিগকে তেমন পূর্ণ বলা যাইতে পারে না, তাহাতেই তাঁহারা আমাদিগের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়াদি কার্য্যে আধিপত্য করিতে মহেশ্বরের ন্যায় পরাঙ্মুখ নহেন।

ব্রহ্মা আমাদের কর্ম্মানুসারে আমাদিগকে সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু আমাদিগকে কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করাইবার জন্য প্রতিপালন করিতেছেন, রুদ্র সেই কর্ম্মভোগান্তে আমাদের সংহার সাধন করিয়া থাকেন।

তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে এই তিনটী ব্যাপারকে আমরা কর্ম্মজনিত সংস্কার দ্বারা জন্ম, আয়ুঃ ও ভোগ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি। এখানে তাহা ঈশ্বর ও দেবতাদিগের আয়ত্ত বলা হইল। পরীক্ষক যেমন প্রশ্নোত্তরানুসারে ফল দেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি ঈশ্বরগণও তেমন আপন আপন অধীনস্থ দেবতা বিশেষ দ্বারা আমাদের কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকেন।

আমাদের জন্ম, মৃত্যু, ব্রহ্মা ও রুদ্রের অধীনে; ভোগ দেন—বিষ্ণু। জন্ম, মৃত্যু অল্প সময়েই সম্পাদিত হইয়া থাকে কিন্তু সমস্ত আয়ুষ্কাল

ভরিয়া ভাল মন্দ ভোগ করিতে হয়, তাহা পালনকর্ত্তা বিষ্ণুদ্বারা পরিচালিত হওয়াতে সাধারণতঃ, দেবতাগণ জগৎ রক্ষা করিতে নিযুক্ত বলিয়া কথিত হন,—"ন দেবাঃ সৃষ্টি নাশকাঃ।"

রাজগণ কর্ম্মচারীদ্বারা প্রজা শাসন করেন এবং প্রজাদের দেয় রাজস্ব হইতে কর্ম্মচারীদিগের বেতন দিয়া থাকেন, তেমন দেবতাগণও মনুষ্যকৃত যজ্ঞদানাদি ধর্ম্ম-ক্রিয়া দ্বারা পুষ্ট হইয়া থাকেন। তাঁহারা পুষ্ট ও তুষ্ট হইলে মনুষ্যের মঙ্গল সাধিত হয়।

এ বিষয়ে তর্কিত হয় যে, যদি ঈশ্বর ও দেবতাগণ নিতান্তই আমাদের কর্ম্মফল মাত্র দেন, তদতিরিক্ত কিছু করিতে না পারেন, তবে তাঁহাদের তুষ্টির জন্য আমরা যত্ন করিব কেন? এতদুত্তরে বক্তব্য—যজ্ঞ, দান, তীর্থসেবা প্রভৃতি যাহা আমাদের মধ্যে সৎ বা পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া গণ্য তাহাই দেবতাদিগের পুষ্টি ও তুষ্টি জনক ব্যাপার। মনুষ্যবশ করার ন্যায়, নীচ কার্য্যসাধন দ্বারা দেবতা-তুষ্টি করিতে হয় না; আর স্তুতি করা বলিতে,আমরা মিথ্যা খোসামোদ বুঝিয়া লই; কিন্তু দেবগণের স্বরূপোক্তি নিন্দাজনক হইলেও, তাহা যে স্তুতির মধ্যে গণ্য, একথা কি আমরা বুঝিতে পারি? শিবকে উগ্র উন্মাদ, বিষ্ণুকে মায়াবী (ভেল্কীবাজ), ব্রহ্মাকে কন্যাগামী (সন্ধ্যাপতি), ইন্দ্রকে সহস্রলোচন (গুরুপত্নীগামী), শনিকে কুব্জ, কালীকে কোটরাক্ষী বলিলে স্তব করা হয়, এ সম্বন্ধে গাঁথা প্রচলিত আছে যে—"উচিত কথায় দেবতা হন তুষ্ট, মনুষ্য হন রুষ্ট।" অধুনা মানবসমাজ সত্যকথাতে এত রুষ্ট হয়, যে তাদৃশ সত্য উক্তি বন্ধ করার জন্য, আইন নজীর প্রণয়ন করা হইতেছে। দেবলোকে ইহার বিপরীত ভাব। যাহারা শাস্ত্রার্থদ্বারা দেবতাদিগের স্বরূপ প্রকাশক বিজ্ঞান বিদিত আছেন তাঁহারাই তাদৃশ বিজ্ঞানে আরূঢ় হইয়া দেবস্তুতি করিতে সমর্থ হন। স্তুতি উপলক্ষে বিজ্ঞান স্মরণ করাতে

সাধকের আত্মোন্নতি ঘটে। এজন্য জপ ও স্তবাদি, পুণ্যকার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। অনাদি প্রচলিত অমোঘ-বেদবাক্যানুমোদিত বিজ্ঞানমূলক মন্ত্র ও স্তবাদি পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ বা জপ করিতে থাকিলে, সাধকের হৃদয়ে তাহার অর্থ স্বরূপ বিজ্ঞানটী আবির্ভূত হয়। এ সম্বন্ধে যোগ-সূত্রের ভাষ্যে বেদব্যাস কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত বচন, প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে যে—

"স্বাধ্যায়াদ্ যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়মামনেৎ।
স্বাধ্যায়যোগসম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে॥"

পাতঞ্জলসূত্র ভাষ্য ১ম পাদ। ২৮ সূং ভাঃ।

মন্ত্র জপ পাঠাদি দ্বারা যোগলাভ করা যায়—এবং যোগ দ্বারা তাদৃশ জপ পাঠাদি সাধিত হয়, সেই জপাদির বা যোগের সাহায্যে পরমাত্ম-ভাবের বিকাশ হইয়া থাকে। এদিকে দেবতাগণ আমাদের অপেক্ষা বিশিষ্ট জ্ঞানবান্ ও বেদনিষ্ঠ থাকাতে আমরা অর্থ না বুঝিয়া তাদৃশ স্তব জপ করিলেও, তচ্ছ্রবণে দেবতা, ঋষি, সিদ্ধ প্রভৃতি পুলকিত হইয়া থাকেন। এজন্য বাহ্যপূজা অপেক্ষা জপ ও স্তবের শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তিত হয়।

এতদ্ভিন্ন স্বার্থ সাধন ভাবেও দেবতুষ্টির আবশ্যকতা প্রতিপাদন করা যাইতেছে। মনে কর পোষ্টাফীসের কর্ম্মচারীরা ত আমাদের বস্তুই আমাদিগকে দিয়া থাকে; আমরাই প্রথমে সেবিংব্যাঙ্কে টাকা জমা দেই, আমাদের প্রাপ্য টাকাই মাণিঅর্ডারে প্রেরিত হয়, আমাদের দ্রব্যজাত, পার্সেলে আইসে, আমাদের কাগজপত্র পূর্ব্বে ডাকঘরে অর্পিত হয়, তথাপি আমরা তাহাদের মুখাপেক্ষা করি কেন? আর তাহাদের সঙ্গে প্রণয় রাখিতেই বা যাই কেন?—শুদ্ধ বিলির অগ্রপশ্চাৎ হওয়ার প্রত্যাশা বই, আর কোন্ হেতু দেখা যায় না।

দেবতাগণও আমাদের জন্ম, মৃত্যু, সুখ ও দুঃখের বিলি ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তাঁহারা আমাদের কর্ম্মফল গুলি অগ্রপশ্চাৎ করিয়া প্রয়োগ করিতে সমর্থ থাকাতে তাঁহাদের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলে আমা-দের কোন্ স্বার্থ-সাধন অবশিষ্ট থাকে? সাবিত্রী যমকে তুষ্ট করিয়া সত্যবানের জীবন লাভ করিয়া ছিলেন; পরশুরাম রুদ্রের আরাধনা দ্বারা পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করিতে পারিলেন। অজা-মিল চিরজীবন পাপ করিয়াও বিষ্ণুদূতদিগের প্রভাবে উপস্থিত মৃত্যু হইতে রক্ষিত হইয়া, শেষ জীবনে ধর্ম্ম সাধন করতঃ বৈকুণ্ঠগামী হইয়া ছিলেন। প্রবীন লোকের মুখে শুনা গিয়াছে—এক ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা অবৈধ কর্ম্ম করিয়া বেড়াইত কেবল স্নানান্তে "চিত্রগুপ্তায় নমঃ" বলিয়া প্রত্যহ এক গণ্ডূষ জল দান কারত। মরণান্তে চিত্রগুপ্ত, সেই ব্রাহ্মণের সামান্য পুণ্যের ভোগ অগ্রে হইবার ব্যবস্থা করতঃ তাঁহাকে একদিনের ইন্দ্রত্ব দেওয়াইলেন এবং বলিয়া দিলেন যে কুবেরের ভাণ্ডারে যত সম্পদ্ আছে তাহা এক দিনের মধ্যে দান করিয়া ফেল। তদনুসারে সেই এক দিনে ব্রাহ্মণের এত পুণ্য-সঞ্চয় হইল, যে তদ্দ্বারা তাহার নরকগতি না হইয়া দীর্ঘকাল স্বর্গবাস ঘটিয়া ছিল। আবার ইহার বিপরীত কার্য্য করিলে উণ্টা ফল ঘটিয়া থাকে।

এইরূপে শুভাশুভ কর্ম্মের ফল অগ্রপশ্চাৎ করিয়া প্রয়োগ, যে কেবল মনুষ্য লোকেই ঘটিতে পারে—দেবলোকে হয় না, এমন নহে; প্রত্যুত দেবতাগণও তাদৃশ নিগ্রহানুগ্রহের ফলভোগ করিয়া থাকেন। নহুষ রাজা অসামান্য পুণ্য-প্রভাবে দেবত্ব-শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া ছিলেন, কিন্তু সেই দেবভোগে থাকিয়াও ঋষিদিগের কোপ প্রজ্জ্বলিত করাতে, স্বর্গভোগের পরিবর্ত্তে তাঁহার জন্য পাপজনিত দুঃখভোগের ব্যবস্থা হইয়াছে। এখানে, ঋষিশাপ নহুষের দুর্গতির কারণ হইলেও, তাহা

নিমিত্ত মাত্র, তাহার স্বকৃত পাপভোগই মুখ্য কথা। এতৎ সম্বন্ধে যোগসূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ ব্যাস বলিয়াছেন—"সচাপি পাপকর্ম্মাশয়ঃ সদ্য এব পরিপচ্যতে তথা নহুষোহপি দেবানামিন্দ্রঃ স্বকং পরিণামং হিত্বা তির্য্যক্তেন পরিণত ইতি।"

যদি বল,—দেবতারা আমাদের অশুভ ফলটী চাপা রাখিয়া শুভ ফল প্রদান করিতে সমর্থ হইলেও তাহাতে আমাদের লাভ কি? পাপ-কর্ম্মের অশুভ ফল ত পরে ভুগিতে হইবেই? এতদুত্তরে বক্তব্য যে—সঞ্চিতপাপ কর্ম্ম গুলির ফল যে নিশ্চয়ই ভুগিতে হইবে এমন বলা যাইতে পারে না। বেদবিহিত প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা পাপকর্ম্মের ক্ষয় হইতে পারে। ফলতঃ সমস্ত না হউক, শুভাশুভ কর্ম্মফলের মধ্যে অনেকটা কাটাকাটি হইয়া যায়। দেবতারা যদি আমাদিগকে সুমতি দিয়া বৈধ কার্য্যে নিয়োগ করেন, তাহা হইলে আমাদের পুণ্য কার্য্যের প্রভাবে অনেকগুলি পাপ ক্ষয় হইয়া যাইতে পারে; সুতরাং তাহা আর ভুগিতে হইবে না। এতদ্ভিন্ন ইতিমধ্যে পরমার্থ জ্ঞানের উদয় হইলে পর, শুভাশুভ কোন কার্য্যই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

অতএব কোন্‌কার্য্য ধর্ম্ম, কোন্‌টী অধর্ম্ম, এই বিষয় জানিয়া রাখা আবশ্যক।

ডাকঘর সংক্রান্ত কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য যেমন নিয়মাবলী পুস্তক রহিয়াছে, তেমন আমাদের ও দেবতাদিগের মধ্যে কর্ম্মফলের বিলি ব্যবস্থার বিষয়, এবং কি করিলে কোন্ দেবতা তুষ্ট বা রুষ্ট হন এবং তদ্দ্বারা কিরূপ ইষ্টানিষ্ট ঘটিতে পারে এ সকল ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য কথা বেদাদি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে স্মৃতির বচন এই যে—

দেবাধীনাজ্জগৎসর্ব্বে মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতাঃ।
তে মন্ত্রাব্রাহ্মণজ্ঞাতাস্তস্মাদ্ব্রাহ্মণদেবতা॥

সমস্ত জগৎ দেবতাদিগের দ্বারা চালিত হয়, সেই দেবগণ মন্ত্র দ্বারা পরিচালিত ; তাদৃশ মন্ত্রগুলি ব্রাহ্মণগণ বিদিত থাকাতে, ব্রাহ্মণকে দেবতা বলা যায়।

এখনকার মনুষ্যেরা যে, সেই সকল শাস্ত্র জানিয়া তদনুরূপ বিধি ব্যবস্থা মতে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, এমন আশা করা যায় না। তবে আমাদের কর্ম্মের আদর্শস্বরূপ কাহাকে ধরা হইবে, ইহাই সমস্যা হইয়াছে। শাস্ত্র সকল এই বিষয়েও নীরব নহে।

"দেশধর্ম্ম-জাতিধর্ম্মকুলধর্ম্মান্ শ্রুত্যভাবাদব্রবীন্মনুঃ।"

বশিষ্ঠ সংহিতা ১ম অধ্যায়।

যখন বেদবিচার করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করার সুবিধা না থাকে, তৎকালে জাতীয় ও দেশপ্রচলিত ধর্ম্ম এবং কুলাচার মতে আগত ধর্ম্ম ব্যবহারকে আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে হয়, ভগবান্ মনু এই মত প্রচার করিয়াছেন।

যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্নদুষ্যতি॥

আহ্নিকপদ্ধতিধৃত মনুবচনম্।

ইহার ভাবার্থ এই, যে আমাদের প্রাচীন পুরুষদিগের সমাজে যখন বেদাদির চর্চ্চা ছিল, তাঁহারা বেদের যথার্থ মর্ম্ম অবগত হইয়া আপনাদের মধ্যে তদনুরূপ ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। এখন, কালের প্রভাবে যবন ম্লেচ্ছাদির সংসর্গ বশতঃ যদিও হিন্দুসমাজে তাদৃশ শাস্ত্র সঙ্গত আচারের বিস্তর ব্যত্যয় ঘটিয়াছে তথাপি তাহা বিলুপ্ত হয় নাই। এমতাবস্থায় আমরা পিতৃপিতামহাগত সেই প্রাচীন আচারকে, আদর্শ করিয়া চলিতে পারিলেই আমাদের পক্ষে বৈদিকধর্ম্ম প্রতিপালন করা হয় এবং তদ্দ্বারা দেবতাগণ প্রসন্ন থাকেন।

নব্যশিক্ষাই এই ধর্ম্মসাধনের সর্ব্বপ্রধান প্রতিপক্ষ। এই শিক্ষা বলিতেছে উদারচেতাঃ (Liberal) হও, সাবেক ভাঙ্গিয়া নূতন গড়িতে থাক।

বংশ পরম্পরাগত আচারকে ধর্ম্মসাধনের আদর্শ বলাতে অনেকের মনে সন্দেহ হইতে পারে যে,—চোর ডাকাইতের সন্তানদিগের চুরি ডাকাইতি করা, জেলের সন্তানের মৎস্য মারা এবং ব্যাধের পুত্রের পশুপক্ষ্যাদি শীকার করা, ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে কিনা? এই কথার দুইটী উত্তর হইতেছে,—প্রথমতঃ, চুরি ডাকাইতি করা পূর্ব্ব পুরুষের আচার হইলেও তাহাকে ধর্ম্ম বলা যায় না। তাহা চারি পাঁচ পুরুষ যাবৎ অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতে পারে, কিন্তু অতি প্রাচীনকালাবধি চলিত নহে। একেত রাজশাসনে নিবারিত হয়, তাহার পর ধর্ম্মের শাসনে তাদৃশ পাপিগণের বংশলোপ ঘটে; সুতরাং উহা কুলাচার হইতে পারে না। বংশগত সদাচার বলিতে শাস্ত্রসম্মত যে অভিনয় (কাল-স্রোতে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াও) অধস্তন পুরুষদিগের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই বুঝিতে হইবে। যেমন, আমাদের মধ্যে উপনয়ন ও তাম্রকুট সেবন উভয়ই বংশপরম্পরাতে চলিয়া আসিতেছে, তন্মধ্যে উপনয়ন ক্রিয়া, বেদ স্মৃতি ও পুরাণসম্মত সদাচার; তামাক খাওয়া তেমন নহে;—তাহা পূর্ব্বে ছিল না, মুসলমান রাজাদের সময় হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। চুরি ডাকাইতিও তেমন কার্য্য, তাহা শাস্ত্রসিদ্ধ কোন জীবিকা নহে।

দ্বিতীয়তঃ মৎস্য জীবীর মৎস্যবধ এবং ব্যাধের মৃগয়া, শাস্ত্রসম্মত জীবনোপায়; তাহা তাহাদের বংশধরদিগের পক্ষে স্বধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয়। মৎস্যজীবী ও ব্যাধের সন্তানদিগের জন্মান্তরীয় মৎস্য ও পশুবধ জনিত সংস্কারের পরিণতিতেই জেলে ও ব্যাধের ঘরে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে, ইহ জীবনে তাহার অন্যথা করিলে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কার্য্য করা

হয়। অস্বাভাবিক কার্য্য দ্বারা শুভ ফলের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। অথচ স্বভাবগত কার্য্য করিলে দোষ হয় না। গীতাতেও এই কথাই কথিত হইয়াছে যথা—"স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥" এই কথার উদাহরণ এই যে—বিষ, সকল জীবের প্রাণ-হানি করে, কিন্তু বিষজাত কীটাণু, বিষ খাইয়া বিষে থাকিয়া স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। জন্মান্তরীয় সংস্কারানুসারে বিধাতা, আমাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে সৃষ্টি করিয়াছেন,—তাঁহার অভিপ্রায় এই যে—আমরা সেই সকল জাতি-ধর্ম্মানুসারে আচরণ করি; তেমন করিলেই বিধাতার অভিপ্রায় সম্পাদন দ্বারা, তাঁহার পূজা করা হইয়া থাকে। তখন বিধাতা তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে সিদ্ধি প্রদান করেন। এজন্যই ভগবদ্গীতাতে স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করার জন্য অর্জ্জুনকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করা হইয়াছিল। যথা—

স্বকর্ম্ম-নিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু।
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ১১শ অধ্যায়।

স্বভাব-জাত-কর্ম্ম সাধনে তৎপর হইলে, যে কারণে সিদ্ধিলাভ ঘটে, তাহা শ্রবণ কর;—যিনি সমস্ত প্রাণীকে বিশেষ বিশেষ কার্য্যে প্রবৃত্ত করতঃ এই জগৎসংসার রচনা করিয়াছেন, মনুষ্য সেই স্বকর্ম্ম সাধন দ্বারা, তাঁহার অর্চ্চনা করতঃ সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে।

এজন্য জন্ম উপলক্ষে প্রাপ্ত কর্ম্মগুলি গর্হিত হইলেও, তাহা ত্যাগ না করিয়া সমাধা করিয়া যাওয়া উচিত।

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভাহি দোষেন ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥ গীতা।

হে অর্জ্জুন! জন্ম উপলক্ষে যাহাতে যে কর্ম্ম যোজিত হইয়াছে, সেই

সহজাত কর্ম্ম, দোষযুক্ত হইলেও ত্যাগ করিতে নাই; কারণ, যেমন অগ্নি থাকিলেই ধূম থাকে, তেমন কর্ম্ম থাকিলে তাহাতে দোষও থাকিবেই। নব্য শিক্ষিতেরা বুদ্ধি বিবেচনা পূর্ব্বক আপনাদের জন্য এক একটী ধর্ম্ম-মত গড়াইয়া লন,—তাঁহারা বুঝেন না যে ইহাতে নিজের শিরে দায়িত্বের বোঝা লওয়া হয়। এমন না করিলে, বলিতে পারিতেন—ঈশ্বর ! তুমি আমাকে যেমন ঘরে পাঠাইয়া দিয়াছ, আমি তেমন কর্ম্মই করিয়া আসিতেছি, সয়তানের বুদ্ধিতে খোদার উপর 'খোদ্‌কারি' করি নাই।

তাহাতেই বলি—জেলের ছেলের মাছ মারাই স্বধর্ম্ম, তজ্জন্য তাহার অপরাধ নাই। পাতঞ্জল যোগসূত্রের ভাষ্যে ভগবান ব্যাস ইহাই বলিয়াছেন—

"তত্রাহিংসা জাত্যবচ্ছিন্না মৎস্যবধকস্য মৎস্যেষেব নান্যত্রহিংসা।"

৩১ সূত্র ২য় পাদ।

তন্মধ্যে মৎস্যজীবীদিগের মৎস্য বধ করা, জাতীয় কার্য্যহেতু অহিংসা বলিয়া গণ্য, তাহারা অন্য প্রাণী হিংসা করিলে বধের জন্য দায়ী হয়।

নব্য শিক্ষিতগণ, পূর্ব্বজন্ম ও জন্মান্তর না বুঝাতে এই সকল কথা ধরিতে পারেন না। তাঁহারা বুঝেন—সকলেই ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রাণী; অতএব একে অন্যকে বধ করিলেই দোষী হয়, এজন্য দেবার্চ্চনা কার্য্যে পুরুষ পরম্পরাগত ছাগ-বলিদান উঠাইয়া দিয়া, ধর্ম্ম করিলেন বলিয়া তুষ্ট হন। এ কথা তাঁহাদের বুদ্ধিতে আইসে না, যে বধ করা যদি একান্তই অস্বাভাবিক হইত, তবে মৃত্যু হয় কেন ? ব্যাঘ্র, কুম্ভীর প্রভৃতির মধ্যে হিংসা প্রবৃত্তি কি ঈশ্বর কর্ত্তৃক যোজিত হয় নাই ?—তাহা কি সয়তান সৃষ্টি করিয়াছে ? যদি কোন কোন অবস্থাতে প্রাণি-হিংসাকে জীবের কর্ত্তব্য মধ্যে ভুক্ত করিতে প্রস্তুত হও, তবে সেই অবস্থাগুলি,

তোমাদের বুদ্ধির মীমাংসা দ্বারা স্থির না করিয়া, শাস্ত্রোক্ত ঋষিবাক্য দ্বারা কি নিরূপণ করা উচিত নয়?

শাস্ত্র-সকল, হিন্দুর জন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি মূল জাতির ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রত্যেক জাতি, আপন আপন জাত্যুচিত কর্ম্ম সমাধা করিতে পারিলে, সিদ্ধিলাভ করিয়া আত্ম-জ্ঞান লাভের উপযোগী হয়। এই 'আত্ম-জ্ঞান' লাভই সকল জীবের চরম লক্ষ্য, তাহা জাত্যুচিত কার্য্য দ্বারা প্রাপ্য হওয়াতে, কোন জাতির উচ্চ-কার্য্য অন্য জাতির নীচকর্ম্ম জাতিধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রের মধ্যে পক্ষপাত থাকার আশঙ্কা করা যায় না।

উক্ত চারিবর্ণের মনুষ্যগণ, যদি স্ব স্ব জাতিধর্ম্ম মতে চলিয়া আত্ম-জ্ঞান লাভের উপযোগী হওয়ার পূর্ব্বেই মরিয়া যান, তবে তাঁহাদের সংস্কার অনুসারে যে যে গতি হইয়া থাকে, তাহাও শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যথা—

প্রাজাপত্যং ব্রাহ্মণানাং স্মৃতং স্থানং ক্রিয়াবতাম্।
স্থানমৈন্দ্রং ক্ষত্রিয়াণাং সংগ্রামেষ্বপলায়িনাম্॥
বৈশ্যানাং মারুতং স্থানং স্বধর্ম্ম-মনুবর্ত্ততাম্।
গান্ধর্ব্বং শূদ্র-জাতীনাং পরিচারেণ বর্ত্ততাম্॥

বিষ্ণুপুরাণে ৬ অধ্যায় কৌর্ম্মে ২য় অঃ গারুড়ে ৪ অঃ দ্রঃ।

ক্রিয়ান্বিত ব্রাহ্মণদিগের প্রজাপতি লোক, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ ক্ষত্রিয়-দিগের ইন্দ্রলোক, স্বধর্ম্মপরায়ণ বৈশ্যদিগের মরুৎ দেবতাগণের স্থান এবং পরিচর্য্যাশীল শূদ্রগণের গন্ধর্ব্বলোক লাভ হইয়া থাকে।

অধুনা ভূমণ্ডলে যত প্রকার মনুষ্য বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্মেই মুক্তির কথা নাই। বৌদ্ধদিগের মধ্যে যে মুক্তির প্রসঙ্গ শুনা যায়, তাহাও হিন্দুশাস্ত্রের ছায়ামাত্র, ফলতঃ চার্ব্বা-

কাদি বৌদ্ধ দার্শনিকেরা মৃত্যুতেই জীবের মুক্তি অনুমান করেন। হিন্দুদিগের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে যে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যসকল জাতিধর্ম্ম বলিয়া অনুষ্ঠান করার ব্যবস্থা আছে, তাহার চরম লক্ষ্য—জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা মুক্তিলাভ করা। সেই সকল জাতিধর্ম্ম, জন্মগত প্রকৃতির সহিত মিলাইয়া এমন ভাবে গঠিত হইয়াছে, যে তাহা অনুষ্ঠান করিয়া যাইতে পারিলেই মরণান্তে স্বর্গলাভ হয়।

। তেমন

আধুনিক লোকেরা "ধর্ম্ম" বলিলেই উপাস্য বিশেষের [illegible]মোদ করা কিম্বা নিরীহ ভদ্রলোক হওয়া অথবা স্ত্রীপুত্রাদি পরিজন ছাড়িয়া বনে বাস করা বুঝে। তাহারা আপন আপন জাতীয় পেশাদ্বারা পোষ্য-বর্গের প্রতিপালন ও অতিথি অভ্যাগতদিগের ভোজন দান প্রভৃতি নিত্যকার্য্যকে, ধর্ম্মের বাহির্ভূত ব্যাপার মনে করে। হিন্দুদিগের সেই সকল জাতীয় পেশা যে জন্মগত-স্বভাবের সহিত মিলাইয়া রচিত হইয়াছে, এ রহস্য প্রায় কেহই জানে না। ব্রাহ্মণের জাতীয় উপজীবিকা (পেশা)—যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ; ইহাতে কিয়ৎ পরিমাণে দেবোপাসনা থাকিলেও (উদ্ধৃত শ্লোক মতে) ক্ষত্রিয় সন্তানের যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, বৈশ্যপুত্রের কৃষিবাণিজ্য, শূদ্রের ছেলের উক্ত তিন জাতির চাকরী করা দ্বারাই জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা হয়, তাহাতে কোনরূপ দেবোপাসনা দেখা যায় না, অথচ তেমন করিয়া যাইতে পারিলেই মরণান্তে স্বর্গ হইয়া থাকে। এইরূপ মৎস্যজীবী প্রভৃতি সঙ্কর জাতিরও, জাত্যুচিত জীবিকা দ্বারা স্বর্গ লাভ হয়।

এখানে আমরা ঋষি-সম্মত ধর্ম্ম সাধনের আদর্শ স্বরূপ, বেদস্মৃতি ও পুরাণ শাস্ত্র এবং তদভাবে বংশ পরম্পরাক্রমে আগত প্রাচীন কালের আচারকে দেখাইয়া দিলাম। অনেকে ইহাতেও তৃপ্ত নহেন, তাঁহারা আমাদের নিকট হইতে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের তালিকা চাহেন;

এ বড় শক্ত ব্যাপার। এখন প্রবল-কলিযুগের প্রভুত্ব চলিতেছে। এই সময়ের উপযোগী ধর্ম্ম বলা সহজ নহে। বিশেষতঃ আমাদের মধ্যে সংস্কারের তারতম্য থাকাতে সকল হিন্দুর জন্য এক ব্যবস্থা কখনই হইতে পারে না।

আমরা যখন স্কুলে প্রবেশ করিয়া প্রথম পাশ্চাত্য ভাবে শিক্ষালাভ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তখন বুঝিয়াছিলাম,—আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ বড় মূর্খ, তাঁহারা না বুঝিয়া কতকগুলি ধর্ম্মক্রিয়া করিয়া থাকেন, তাহাতে কোন ফলের প্রত্যাশা নাই; শাস্ত্রগুলিও তত মূল্যবান্ নহে। সাহেবেরা তেমন নহেন.—তাঁহারা পরীক্ষা না করিয়া কিছুই করিতেছেন না তাঁহারা যাহা বলেন, তাহাতে অনাস্থা করা যাইতে পারে না। সাহেবেরা আমাদের প্রতি অনুগ্রহপূর্ব্বক স্কুল কলেজ ও পুস্তক পত্রিকা প্রচলন করিয়া আমাদের মধ্যে যথার্থ জ্ঞানালোক বিতরণ করিতেছেন। অতএব আমরা বুঝিয়া সুঝিয়া ধর্ম্মকার্য্য করিব।

আমরা দিন দিন যতই শিক্ষাপথে অগ্রসর হইলাম, ততই উক্ত ধারণার মূলোচ্ছেদ হইতে লাগিল। বুঝা গেল—এতদ্দেশে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচারিত হইতেছে তাহা কেবল দয়া বা অনুগ্রহ মূলক নহে, তাহার মূলে রাজনীতি নিহিত রহিয়াছে—নতুবা দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য রপ্তানি বন্ধ হয় না, কিন্তু নব্য শিক্ষার জন্য ঘরে ঘরে মেমসাহেবের আবির্ভাব হয় কেন? আবার সেই রাজনীতির সহিত ধর্ম্মনীতির সংস্রব নাই।

কাযেই চারিদিকে দেখিয়া শুনিয়া সেই উপেক্ষিত পৈত্রিক ধর্ম্ম আশ্রয় করা ভিন্ন, গত্যন্তর দেখা যায় না। কিন্তু আমরা এতদূর ছাড়িয়া আসিয়াছি যে—পূর্ব্ব-পুরুষদিগের অনুষ্ঠিত দীক্ষাগ্রহণ করিলেও তাঁহাদের মত হিন্দু হইতে পারিতেছি না—সহসা তেমন করিলে, "শিক্ষ

ভাঙ্গিয়া বাছুরের দলে মেশার” ন্যায় হয়। এজন্য আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত অগ্রে হওয়া আবশ্যক।

তোমরা হিন্দুয়ানীর মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছ, বেদকে রাখালের গান ভাবিয়াছ, শাস্ত্রসঙ্গত সদাচারের শিরে পদাঘাত করিয়া, যবন ম্লেচ্ছের ভাব ধরিয়াছ। সেকালে তোমাদের মত লোকদিগকে হিন্দুস্থান হইতে বহিষ্করণ করিয়া যবন-ম্লেচ্ছ-দেশে নির্ব্বাসন করা হইত। মনুতে ব্যবস্থা আছে—

যোঽবমন্যেত তেমূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।

স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যোনাস্তিকোবেদনিন্দকঃ॥ ১১।২য় অঃ মনুঃ

যে ব্রাহ্মণ যুক্তির আশ্রয়ে বেদ ও স্মৃতির অপমান করিবে, সে নাস্তিক ও বেদনিন্দক, তাহাকে সাধুরা দূর করিয়া দিবেন। অতি প্রাচীনকালে যখন সমস্ত পৃথিবীর লোক হিন্দু অর্থাৎ বৈদিকধর্ম্মাবলম্বী ছিল, তখন তাঁহাদের সমাজে উক্ত ভাবের মনুষ্য প্রাদুর্ভূত হইলে তাহাদিগকে সদলে নির্ব্বাসন করা হইত; সেই সকল নির্ব্বাসিত হিন্দু হইতে বর্ত্তমান যবন ম্লেচ্ছাদি জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। তাহাতেই প্রাচীন গ্রীক প্রভৃতি জাতির ভাষা ও ভাবের সহিত সংস্কৃত ভাষার এত সৌসাদৃশ্য পাওয়া যাইতেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এতদূর হিসাব না করিয়া অনুমান করেন যে—প্রাচীন জাতিগুলি কাস্পীয়ান হ্রদের নিকটে থাকিয়া এক সমাজে নিবদ্ধ ছিল; তাহাদের মধ্যে ভাষা বিভেদ হওয়াতে তাহারা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; তন্মধ্যে হিন্দুগণ সিন্ধুনদপার হইয়া এতদ্দেশে বাস করিতেছে। ফলতঃ হিন্দুগণের সিন্ধুনদ পার হইয়া এদেশে আসিবার কল্পনা অতি অমূলক। বাইবেলের কথিত নোয়ার জাহাজ ও মৎস্যপুরাণের বর্ণিত বৈবস্বত মনুকর্ত্তৃক বৃহৎ নৌকা দ্বারা পূর্ব্বমন্বন্তরীয় এক এক জাতীয় জীবের দম্পতি, জল

প্লাবন হইতে রক্ষা করা, একই ঘটনা বলিয়া ধরা হয়। নোয়ার জাহাজের অবতরণ, কাষ্পীয়ান হ্রদের নিকটে ঘটিয়াছিল বলিয়া বাইবেলে প্রকাশ। তাহাতেই আমরা এতদ্দেশের আদিম নিবাসী নহি বলিয়া স্থির করেন।

সেই বৈবস্বত মনু (বাইবেলের নোয়া), জাহাজ সংগ্রহের পূর্ব্বে কোথায় ছিলেন এই কথা বোধ হয় বাইবেলে লিখা নাই, কিন্তু মৎস্য-পুরাণে তাহা কথিত আছে। যথা—

পুরা রাজা মনুর্ণাম চীর্ণবান্ বিপুলং তপঃ।
পুত্রে রাজ্যং সমারোপ্য ক্ষমাবান্ রবিনন্দনঃ॥ ৯
মলয়স্যৈকদেশেতু সর্ব্বাত্মগুণসংযুতঃ।
সমদুঃখ-সুখোবীরঃ প্রাপ্তবান্ যোগমুত্তমম্॥ ১০

মৎস্যপুরাণ ১ম অধ্যায়।

পূর্ব্বকালে বৈবস্বত মনু নামক ক্ষমাবান্ রাজা, পুত্রের প্রতি রাজ্য সমর্পণ পূর্ব্বক বিপুল তপস্যারম্ভ করিয়াছিলেন। সেই সর্ব্বগুণসম্পন্ন বীর, মলয়াচলে অবস্থান করতঃ সুখ দুঃখে সমভাবাপন্ন হইয়া উত্তম যোগলাভ করিলেন।

এখানে পাওয়া গেল, মনু (নোয়া) জাহাজ নির্ম্মাণের ও পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যস্থ মলয় পর্ব্বতে তপস্যা করিতেন। এতদ্দ্বারা নোয়ার সময়ের আদিম সমাজ, যে কেবল কাষ্পীয়ান হ্রদের নিকটে সীমাবদ্ধ ছিল, এই অনুমান মিথ্যা হইয়া যাইতেছে।

ফলতঃ আমরাই সেই আদিম সমাজ—পূর্ব্বে কাষ্পীয়ান সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিলাম। (এখনও, তথাকার হিন্দুদেবালয়ে হিন্দুদ্বারা দেবসেবা চলিয়া থাকে বলিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সংবাদ পত্রাদিতে প্রচারিত হইয়া ছিল) আজও আমরা পূর্ব্বের ন্যায় বেদবিরুদ্ধবাদী ভ্রষ্টমতি

মনুষ্যদিগকে হিন্দুদল হইতে বহিষ্করণ করতঃ, সেই ম্লেচ্ছ সন্তান-দিগেরই পুষ্টিবর্দ্ধন করিয়া আসিতেছি। এখনকার বিলাত ফেরত সিবিলিয়ান, বারিষ্টার প্রভৃতিই তাহার প্রমাণ।

নব্যশিক্ষিত পাঠক! তুমি কি এ সকল ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পাও? আজ সেদিন বজায় থাকিলে তোমার আমার প্রায়শ্চিত্তই হইত না। আমরা নব্য শিক্ষা দ্বারা এতকাল প্রতারিত হইয়া যে সাহেবী কথার প্রতি দ্বিধা না করিয়া, তাহা বিনা বিচারে মানিয়া আসিতে ছিলাম, এতদিনে সেই ভ্রম বুঝিতে পারিয়াই পুনর্ব্বার পিতৃপিতামহাগত হিন্দুধর্ম্মে আস্থা স্থাপন করিতে যত্নবান হইয়াছি। প্রায়শ্চিত্ত না করিলে যে আমাদের অন্তঃকরণে শান্তি বোধ হয় না। তুমি যদি প্রায়শ্চিত্ত বিনাই তুষ্ট থাকিতে পার; তবে নিশ্চয়ই তোমার ম্লেচ্ছভাব বিদূরিত হয় নাই। তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে কে বলে? আর যদি তুমি স্বীয় দোষ বুঝিতে পারিয়া প্রায়শ্চিত্তের জন্য লালায়িত হইয়া থাক, তবে বলি—বর্ত্তমান সময়ের মধ্যে "বৈধ গঙ্গাস্নান" বিশেষতঃ কাশীতে গিয়া তদ্রূপ স্নান করা, সুবিধা জনক দেখা যায়। প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে, বিনীত ভাবে ভাল ব্রাহ্মণের নিকট উপনীত হইয়া স্বমুখে নিজের দোষ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিতে হয় যে "আপনি দয়া করিয়া আমাকে এই পাপ মোচনের উপায় করিয়া দিন্।" এইরূপে ব্রাহ্মণের উপদেশ মতে প্রায়শ্চিত্ত করিলে, কার্য্যের ঝুঁকি সেই ব্যবস্থা-দাতার উপর আইসে। অতএব নিজের দায়িত্ব হ্রাস হয়।

এইত গেল প্রায়শ্চিত্তের কথা; ইহার পরে কিরূপ ধর্ম্ম করিতে হইবে, তাহা আমাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না। আমারা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমাদের (সংস্কারময়ী) প্রকৃতির মধ্যেই ধর্ম্মভাব নিহিত থাকে; শিক্ষা ও সংসর্গ জনিত বাধাগুলি সরাইয়া দিলেই তাহা স্বয়ং

প্রস্ফুটিত হয়। এজন্য আমরা কাহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে চাহি না, কিন্তু তাহার মধ্যে যে সকল আবর্জ্জনা সঞ্চিত আছে, তাহা সরাইয়া দিতে যত্ন করি, তাহা হইলে অন্তর্নিহিত ব্যক্তিগত ধর্ম্মভাব স্বয়ং বিকাশ পাইতে থাকিবে, এমন আশা করিয়া থাকি।

আমরা পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত যে সংস্কারের প্রস্ফুটনে ম্লেচ্ছকুলে না গিয়া, হিন্দুর গৃহে জন্মলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা পাশ্চাত্য শিক্ষাদ্বারা এতদূর বিকৃত না হইলে, পাঠকদিগকে পিতৃপিতামহাগত সদাচার গ্রহণ করাইবার জন্য, এত কঠিন সাংখ্য-বিদ্যার অবতারণ করিতে হইত না, সেই কুলধর্ম্ম, জন্মগত হিন্দু-সংস্কারের বলেই পাঠকদিগের দ্বারা স্বয়ং অনুষ্ঠিত হইত; এত কাঠ খড়ের প্রয়োজন হইত না। পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত হিন্দুগণ ইহার উদাহরণ স্থল। তাঁহারা আজও এতটা আত্ম-হারা হন নাই।

পাশ্চাত্য শিক্ষার বিষ, বাল্যকাল হইতে ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, বুদ্ধিকে এতই আয়ত্ত করিয়া ফেলে, যে শেষে বয়ঃস্থ হইয়া নিরপেক্ষ ভাবে সত্য নিষ্কাশন করার আর সামর্থ্য থাকে না। মনে কর—সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র একবাক্যে পৃথিবীকে অচলা বলিতেছে, তুমি প্রত্যক্ষেও তাহা দেখিতেছ, অথচ কোন সাহেব পৃথিবী হইতে অন্যত্র গমন করিয়া অচলাকে সচলা দেখিয়া আইসে নাই; তথাপি তুমি বিশ্বাস করিতেছ যে পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘূরিতেছে। চিরপ্রসিদ্ধ কথা যে, বেদের কেহ কর্ত্তা নাই—উহা অপৌরুষেয়, সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অনাদি কাল যাবৎ আবির্ভূত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু তুমি জান,—উহা বাইবেল ও কোরাণের ন্যায় মনুষ্য দ্বারা রচিত গ্রন্থবিশেষ। কেবল তাহাও নহে, শাস্ত্রে বলে—"এক আসীদ্‌যজুর্ব্বেদস্তঞ্চতুর্দ্ধাব্যকল্পয়ৎ।" পূর্ব্বে এক যজুর্ব্বেদ ছিল, পরে ব্যাস তাহাকে সাম, ঋক, যজু ও অথর্ব্ব এই

চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—তুমি কি তাহার সন্ধান রাখ? অথচ সাহেবদিগের তালে নাচিয়া বল—ঋগ্বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, যজুঃ প্রভৃতি পরে প্রস্তুত হইয়াছে। হে হিন্দুগণ! ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এই সকল কথা শুনিলে তোমরা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে, আজ কোন্ কুহকে পড়িয়া তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতেছ?—আমাদের একটী প্রধান ভুল এই হইয়াছে যে—আমাদের শাস্ত্র আমরা নিজে না দেখিয়া কুটিল মতি স্বার্থপরায়ণ ম্লেচ্ছের মুখে শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিয়াছি। তাহাতেই ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অধর্ম্ম সংগ্রহ হইয়াছে। এজন্য আমরা কাহাকেও ধর্ম্মপথে চালিত করার জন্য নির্দ্দিষ্ট উপদেশ প্রদান করিতে চাহি না—জ্ঞান যে নব্যশিক্ষাজনিত আবর্জ্জনাগুলি সরাইতে পারিলেই, সে আপন স্বভাবানুযায়ী ধর্ম্মসাধন করিতে প্রবৃত্ত হইবে। এই নিমিত্ত লোকের দোষ দেখাইতে যত্ন করি। তবে নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যের মধ্যে এই মাত্র বলি, যে,—গয়াতে গিয়া মৃত আত্মীয়-বান্ধবদিগের পিণ্ডদান করিতে যত্ন করা, হিন্দুমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

তাহাতে যেমন মৃতদিগের উপকার সাধন হইবে, তেমন আপনাদেরও মঙ্গল সম্ভাবনা আছে। বিশেষতঃ যাহাদের সন্তান হইয়া নষ্ট হয় কিম্বা জাতসন্তানদিগের মধ্যে সর্ব্বদা পীড়ার উপদ্রব ঘটে এবং গৃহে উঁই, ইন্দুর, অগ্নি, চোর প্রভৃতি দ্বারা সহসা অভাবিতরূপে, মূল্যবান্ দ্রব্যজাত নষ্ট হইয়া যায়, অথবা পরিবারবর্গের মধ্যে নিত্য কলহ ঘটে কিম্বা হঠাৎ মোকদ্দমা বাঁধিয়া অর্থ ক্ষয় ঘটিতে থাকে, এই সমস্ত বংশগত প্রেতের কার্য্য; গয়াতে পিণ্ডদান দ্বারা এতাদৃশ দৈব উৎপাত রহিত হইতে পারে।

সমাপ্ত।